মার্কসবাদী পথ

৩৯বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ মে ২০২০

প্যান্ডেমিক

বিশেষ অনলাইন সংখ্যা

মার্কসবাদী পথ

৩৯বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ মে ২০২০

সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র

সহযোগী সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী
শান্তনু দে

সূচীপত্র

০৫ সম্পাদকীয়

১০ বিশ্বায়ন ও মহামারী
প্রভাত পট্টনায়েক

২৪ কোভিড ১৯, লকডাউন ও নয়া উদারবাদ
রতন খাসনবিশ

৩৬ সামনে লড়াই
তপন সেন

৫২ কৃষিক্ষেত্রের দুর্দশা এবং প্রতিরোধ
বিজু কৃষ্ণান

৬৫ যারা প্রতিরোধ করেছে
দেবাশিস চক্রবর্তী

৭৬ একটি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সংগ্রাম
নীলোৎপল বসু

৯১ পুঁজি, পরিবেশ ও
করোনা মহামারী
অরুণাভ মিশ্র

১১০ অপরিকল্পিত নগরায়ন,
সংক্রমণের আঁতুড় ঘর
পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

১২৮ মজুত বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র
ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

১৩৫ অতিমারী, সাম্প্রদায়িকতা ও
ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ব
তৌষালী রায়না

১৪৩ বাঁকের মুখে বিশ্ব
শান্তনু দে

মার্কসবাদী পথ
৩৯ বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ মে ২০২০

সম্পাদকীয়

করোনাভাইরাসের হঠাৎ আক্রমণে লণ্ডভণ্ড গোটা দুনিয়া। লকডাউনের এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী পথের মতো একটি পত্রিকা কোনওভাবে ছাপানো সম্ভব হলেও, তা সমস্ত পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যে একরকম অসম্ভব, তা বোধকরি সবাই বুঝবেন। সেকারণে এবারে অনলাইন সংস্করণ।

প্যান্ডেমিক বা অতিমারী আসলে একটি বহুমাত্রিক সঙ্কটের অংশ মাত্র।

পুঁজিবাদে নয়া উদারবাদের প্রয়োগ সেই তিয়াত্তর সালে, চিলিতে। মিলটন ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বে শিকাগো বয়েজের হাত ধরে। তারপরে গোটা লাতিন আমেরিকায়। যা তাদের কাছে এখনও এক 'লস্ট ডিকেইড', হারিয়ে যাওয়া দশক। ভারতে এর শুরু নয়ের দশকে। সেইসঙ্গে, আগে-পরে প্রায় গোটা বিশ্বে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই নয়া উদারবাদের পথ বেয়েই ২০০৮ থেকে সঙ্কট। যা গত শতকের তিনের দশকের মহামন্দার চেয়েও গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। কোভিড হামলার আগেও উন্নতির

কোনও লক্ষণ ছিল না। বরং, মন্দার অতলে তলিয়ে যাওয়ার আভাস ছিল স্পষ্ট।

এই উদারনীতিই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঢালাও বেসরকারিকরণ করে। জনস্বাস্থ্য হয়ে ওঠে মুনাফার ক্ষেত্র। জীবনকে বাজি রেখে মুনাফা। চীন থেকে ভিয়েতনাম, কিউবা থেকে কেরালা– কেন এই সাফল্য, তার নেপথ্যে আসলে রয়েছে এই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার বুনিয়াদ। যে আলোচনা নানাভাবে এসেছে প্রভাত পট্টনায়েক, নীলোৎপল বসু থেকে দেবাশিস চক্রবর্তীর লেখায়। সঙ্কটের মধ্যেও চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কেরালা দেখিয়ে চলেছে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে সঙ্কট মোকাবিলা।

আজকের এই ধ্বংসাত্মক অর্থনীতির মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন রতন খাসনবিশ। স্টিমুলাস কী হতে পারত, আর কী হয়েছে, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বেআব্রু করেছেন মোদীর স্টিমুলাসে নয়া উদারবাদী জুমলাকে। ‘এতটা পাপের ভার ভারতবর্ষ বহন করতে পারবে কি?’ সঙ্গত জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। আমরা মনে করি, এই স্টিমুলাস সঙ্কটকে শুধুই আরও তীব্র করবে। মন্দা থেকে মোটেই অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে পারবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কি তার আদৌ কোনও সমাধান আছে? আমরা মনে করি নেই। আমরা তাই একে বলি ব্যবস্থার সঙ্কট। সিস্টেমিক ক্রাইসিস। পুঁজিবাদের জঠরেই আছে সঙ্কটের বীজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে, যেখান স্বাস্থ্য, শিক্ষার খরচ বহন করত রাষ্ট্র, পুঁজিবাদের পক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সে রাস্তা নেই। সেকারণে দুনিয়াজুড়ে ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপে, লাতিন আমেরিকায় ‘সমাজতন্ত্রের’ কথা আসছে। সেই সমাজতন্ত্র, সেই বিকল্প কী, তা নিয়ে নানা কথা আছে। ব্রিটেনে জেরেমি করবিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ণি স্যান্ডার্স, কিংবা ফ্রান্সে জ্যাঁ-লুক মেলেশোঁর বক্তব্য থেকে লাতিন আমেরিকায় উঠে আসছে বিকল্পের কথা। করবিন, স্যান্ডার্স কিংবা মেলেশোঁরা তুলেছেন সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শ্রমঘণ্টা, অবসরের বয়স কমানোসহ ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি। ব্রিটেনে যখন উঠেছে রেল, ডাক, শক্তি সংস্থাগুলির জাতীয়করণের স্লোগান, তখন ফ্রান্সে উঠেছে সমরাস্ত্র শিল্প এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জাতীয়করণের কথা। মার্কিনমুলুকে ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার’ দাবি।

উগ্র দক্ষিণপন্থা আজ বড় বিপদ। একে ছোট করে দেখা

হবে বড় ভ্রান্তি। যেমন শান্তনু দে লিখেছেন। দক্ষিণপন্থা থাকবে দক্ষিণপন্থাতেই। একদল বলছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অটুট রেখেই ফিরে যেতে হবে জাতি-রাষ্ট্রে। তবে বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির আধিপত্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ওই পথে যাওয়া অসম্ভব। জাতি-রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধুঁয়োতে হতে পারে উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান। 'আমেরিকা ফার্স্ট', আমেরিকা আমেরিকার জন্য আসলে মার্কিন জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণবাদ, এক অর্থে বিচ্ছিন্নতা, যেমন ব্রিটেন ব্রিটেনের জন্য। বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্র। ঠিক এই মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব। সঙ্কট-সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণ। পুঁজিবাদে যা হচ্ছে, সহজাত। স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু সমাজতন্ত্র আপনা আপনি হয় না। তাকে নির্মাণ করতে হয়। এটা ঠিক বস্তুগত পরিস্থিতি তার পক্ষে। কিন্তু দরকার বিষয়ীগত পরিস্থিতি। মতাদর্শ, রাজনীতি, সংগঠন, সংগ্রাম। চাই বিপ্লবী ও গণলাইন নির্ভর পার্টি। অন্যদিকে, নৈরাজ্য অরাজকতা শেষ বিচারে সাহায্য করে উগ্র দক্ষিণপন্থাকে।

উগ্র দক্ষিণপন্থার বিপদকে তাই ছোট করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। যেমন তৌষালি রায়না টেনে এনেছেন নোয়াম চমস্কির ব্যাখ্যা। মিডিয়া বিশাল বড় ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু মিডিয়া এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নয় এবং সে শাসক শ্রেণির হয়ে কার্যসম্পাদন করছে। কার্যসম্পাদন মানে এখানে নোয়াম চমস্কির ধারনা ধার করে বলা যায় যে শাসক শ্রেণির আদর্শের পক্ষে সম্মতি নির্মাণ করা। যেমন ভারতে এই মুহুর্তে রাজনৈতিক শাসক শ্রেণি হিন্দুত্ববাদের আদর্শে বিশ্বাসী। এবং এই হিন্দুত্ববাদের আদর্শের চিরকালীন শত্রু হলো মুসলিম সম্প্রদায়।

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী সঠিকভাবেই লিখেছেন এই ব্যবস্থাই বেকারি বাড়াবে, আর এটাই স্বাভাবিক। আমাদের মনে রাখা দরকার, গত শতকের মহামন্দার সময়ে ফ্যাসিবাদ বেকার সমস্যার সমাধান করেছিল যুদ্ধ দিয়ে। কয়েকটি দেশে তো সেসময় প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থান ছিল। কারণ সমরাস্ত্র শিল্প, যুদ্ধ শিল্পের বাড়বাড়ন্তের জন্য। আর এটি এমন একটি শিল্প, যা আসলে মানুষের বাঁচার জন্য নয়, মানুষকে মারার জন্য। এই পৃথিবীতে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ কি এখন আদৌ হতে পারে! ট্রাম্প ও তার উপদেষ্টারা মনে করেন তা সম্ভব। কিন্তু যেটা হতে পারে, তা হলো অনেকগুলি 'লোকাল ওয়ার' স্থানীয় যুদ্ধ, কিংবা 'প্রক্সি ওয়ার' ছায়াযুদ্ধ। যেমন হয়ে আসছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, লেবানন,

লিবিয়া, ইয়েমেন থেকে সিরিয়াতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি মৃত্যু হয়েছে এই স্থানীয় ও ছায়াযুদ্ধগুলিতে। যাইহোক, এ পথে স্থায়ী সমাধান দিতে পুঁজিবাদ অক্ষম। উগ্র দক্ষিণপন্থার এই বিপদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি দরকার। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম হচ্ছে। ২০১৯– বছরভর বিশ্বায়িত প্রতিবাদ। দুনিয়াজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ। সান্তিয়াগো থেকে ওয়েস্ট পাপুয়া। বেইরুট থেকে বাগদাদ। কুইটো থেকে কায়রো। ডেট্রয়েট থেকে শিকাগো। প্যারিস থেকে পোর্ট অব প্রিন্স। আলজেরিয়া থেকে জর্ডন। সর্বত্র বিক্ষোভ। রাস্তায় জনরোষ। তবে একে আরও সংহত করা জরুরি। আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকা তুলে ধরতে হবে।

নয়া উদারবাদের কারণেই বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট। পরিবেশের সঙ্কট। অতি মুনাফার জন্য উৎপাদনের স্বাভাবিক পরিণতি। আলোচনা করেছেন অরুণাভ মিশ্র। করোনাভাইরাসের একটি বড় কারণ হচ্ছে মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদনের জন্য বেপরোয়া মানসিকতার জেরে জীব বৈচিত্র্যে আঘাত। আর এজন্য লক্ষ লক্ষ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রাণী থেকে প্রাণীতে না হয়ে প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। জীব বৈচিত্র্যে আঘাতের কারণেই এটা হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যকে অন্য প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ বা সামগ্রিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সময় চলে গিয়েছে।

করোনায় সারা বিশ্বের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি বড় সঙ্কট। বড় শহরগুলিতেই সংক্রমণ বেশি দেখা যাচ্ছে। এখানে বিশদে আলোচনা করেছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস। পরিসংখ্যান বলছে মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, পুণে, কলকাতা, হাওড়া, হায়দরাবাদ, জয়পুরের মতো ১৩টি শহরে দেশের ৭০ শতাংশ সংক্রমিতের বসবাস। ভবিষ্যতের জন্য জরুরি হলো একটি পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীভূত নগরায়ন।

সঙ্কট কৃষিতে। অন্যান্য সবকিছুর মতোই কৃষি সম্পর্কও দ্রুত বদলাচ্ছে। এখন আর আগের মতো বর্গা চাষ নেই বললেই চলে, যেটা আগে ছিল বড় ইস্যু। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ, ঠিকাচাষ, চুক্তিচাষের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। আর একে ব্যবহার করে কৃষির সমস্যাকে সমাধান করতে চায় দেশী-বিদেশী কর্পোরেট ক্ষেত্র। কৃষককে নিঃস্ব করে চায় কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ। এ এক জটিল সমস্যা। যেখানে পুরনো জোতদারের মতো শত্রুকে আর দেখা যাচ্ছে না সামনে। থেকে যাচ্ছে নেপথ্যে। আসলে লুটেরা পুঁজি। ধান্দার

ধনতন্ত্র। হয়তো সাগরপাড়ের লুটেরা পুঁজির সঙ্গে যুক্ত। সঙ্গে দেশী বা গ্রামের বেড়ে ওঠা নব্য ধনী, কৃষি থেকে আয়ের চেয়ে অ-কৃষি থেকে আয় যাদের সম্পদের প্রধান উৎস। আজকের গ্রাম ভারত, কৃষি ও কৃষির সঙ্কট তুলে ধরেছেন বিজু কৃষ্ণান।

কৃষির মতো শিল্পক্ষেত্রের সম্পর্ক দ্রুত বদলাচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রই হচ্ছে শ্রমিকদের বৃহৎ অংশ। প্রায় ৯৫ শতাংশ। সংগঠিত শিল্পে শ্রমিক আরও কমাবে। পেশা দ্রুত বদলাচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, কনস্ট্রাকশান থেকে ছাঁটাই হয়ে কেউ টোটো চালাচ্ছেন, কেউবা সবজি বিক্রি করছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের শোচনীয় পরিস্থিতি বেআব্রু করেছে শোষণের বর্বর চেহারাকে। গ্রাম থেকে শহরে নয়, কেউ কেউ বলছেন একটা বিপরীত প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে, শহর থেকে গ্রামে। শ্রেণি বৈষম্যের সঙ্গেই প্রকট হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য। দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হবে। আয়ত্ত করতে হবে সংগঠন, সংগ্রামের নতুন ধারা। তপন সেন এনিয়ে আলোচনা করেছেন। কর্মক্ষেত্রে লড়াইয়ের পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। কারখানায় লড়বে, না অন্যত্র। জনগণের মৌলিক দাবি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, কাজ নিয়ে আন্দোলন জরুরি। এগুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যেমন লঙ মার্চে আমরা দেখেছি জনপ্রিয় দাবি হিসেবে উঠে এসেছে দু'মুঠো ভাত, দু'হাতে কাজের দাবি। আমাদের রাজ্যে খাদ্য আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। খাদ্যই প্রধান দাবি। শ্রেণি নির্বিশেষে।

এটা ঠিক বিকল্প সমাজতন্ত্র। কিন্তু বিশ শতকের হুবহু প্রতিরূপ তা হবে না। হওয়ার কথাও নয়। নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে হতে হবে একুশ শতকের স্লোগান। বিকল্পের স্লোগান। সংগ্রামের ময়দান থেকেই তা উঠে আসবে।

বিশেষ কলম

বিশ্বায়ন ও মহামারী

প্রভাত পট্টনায়েক

আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হল যে এটা আসলে লগ্নির বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কাল যার সম্পর্কে লেনিন বিস্তারিত লিখেছিলেন, তখন প্রতিটি নগর শক্তির একটা লগ্নিপুঁজির ভিত্তি ছিল যা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং যা ওই শক্তিধর এলাকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে চলাচলে সক্ষম ছিল। এখন আমরা দেখছি বিশ্বায়িত পুঁজির কোন নির্দিষ্ট দেশ ভিত্তি নেই এবং তা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় মুনাফার সন্ধানে, যার সঙ্গে

শিল্প পুঁজির কোন সম্পর্ক নেই অথবা সেই নগর শক্তির উদ্দেশ্যের কোন মিল নেই। ঘটনা হল সীমান্তের বেড়া পেরিয়ে চলাচল করা লগ্নির দুই শতাংশেরও কমের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, বিশ্বজুড়ে লগ্নির চলাচল কতটা অস্থির।

জাতিরাষ্ট্রের এই বিশ্বে লগ্নির বিশ্বায়নের বিরাট তাৎপর্য রয়েছে, যদি কোন জাতিরাষ্ট্রের সরকার এমন কোন নীতি গ্রহণ করে যা বিশ্বায়িত লগ্নির পছন্দসই নয় তাহলে লগ্নি পুঁজি ওই জাতিরাষ্ট্রের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে ওই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে এবং সেখানকার মানুষ তীব্র সংকটে পড়বেন। এই কারণে প্রতিটি সরকার যতক্ষণ না বিশ্বায়িত লগ্নির জাল থেকে প্রয়োজনে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা রাখছে ততক্ষণ মনে করে যে ওই তথাকথিত বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য বিশ্বায়িত লগ্নির পছন্দসই নীতি প্রয়োগ করে যেতে হবে।

এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে গণতন্ত্রের একটা সীমারেখা আঁকা হয়ে গেছে, যে রাজনৈতিক দল বা জোটই ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসুক না কেন সবাই কমবেশি একই অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে। আর যদি কোনভাবে কোন দল বা বিন্যাস ভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচিত কোনভাবে হয়ে যায় (যা খুবই কঠিন কারণ এমন কোন শক্তি ক্ষমতায় আসার আগেই তাদের ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া মাত্র পুঁজির উবে যাওয়া বা বহির্গমন শুরু হয়ে যায়) তবে তারাও খুব দ্রুত সেই পুরনো লাইনেই ফিরে আসে এবং তাদের নিজস্ব এজেন্ডার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে (যদি না তাদের বিশ্বায়িত লগ্নি প্রবাহের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার বিচক্ষণতা থাকে)। সোজা কথায় বলা চলে দেশের মানুষ অর্থনৈতিক নীতির প্রসঙ্গে কোন বিকল্প পছন্দের সুযোগ পান না। অন্যভাবে বলা চলে গণতন্ত্রের ভিত্তি দেশের মানুষের সার্বভৌমত্বকে কার্যত প্রতিস্থাপিত করে বিশ্ব পুঁজির সার্বভৌমত্ব। এবং এটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যখন লগ্নিপুঁজির মুক্ত চলাচলের ক্ষেত্রটি জাতিরাষ্ট্রের একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্রকে ছাপিয়ে যায়।

যদি জনগণের স্বার্থ লগ্নিপুঁজির স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায় তা হলেও অবশ্য কিছু আসে যায় না। যদিও এক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বেকারীর সমস্যা পুঁজিবাদী বিশ্বে অনেকদিন ধরেই বেড়ে চলেছে তার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বৃদ্ধি যাতে চাহিদার

বৃদ্ধি পায়, অন্যথায় আর্থিক নীতি একটি ভোঁতা অস্ত্র হয়ে থেকে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের এই বিনিয়োগ কার্যকরী করতে হলে পুঁজিপতিদের ওপর কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হয় অথবা আর্থিক ঘাটতি তৈরি করতে হয়। রাষ্ট্রের বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে শ্রমজীবী মানুষ যারা তাদের আয়ের সিংহভাগই খরচ করে ফেলেন তাদের ওপর কর বসানো কোন কাজের কথা নয়। কারণ এটা শ্রমজীবী জনগণের চাহিদা বৃদ্ধির কাজকে প্রতিস্থাপিত করে ফেলে, মোট চাহিদার কোন বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। অন্যদিকে লগ্নি পুঁজি পুঁজিপতিদের উপর কর আরোপ করা কিংবা আর্থিক ঘাটতি দুটোরই বিরোধিতা করে। কাজেই লগ্নিপুঁজির কর্তৃত্ব বেকারির সমস্যার সমাধান করতে দেয় না, একইভাবে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোনরকম বরাদ্দ এবং কল্যাণকর বিনিয়োগ অপছন্দ করে যদি না তা সুবিধা প্রাপকদের পকেট কেটেই করা হয় (যা করা হলে সুবিধা প্রাপকদের কোন সুবিধাই দেওয়া যায় না)।

বিশ্বায়নের এই যুগে জাতি রাষ্ট্রগুলি লগ্নির কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করার ফলে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের

কেইনস, যিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বেকারি হ্রাসের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন কারণ তা না হলে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে না বলে তিনি ভীত হয়েছিলেন। লগ্নি যদি বিশ্বায়িত হয় তাহলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকার সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে দি ইয়েল রিভিউ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে তিনি লেখেন "লগ্নিকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় চরিত্রের হতেই হবে।" এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি যে ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিলেন তাতে রাষ্ট্র গুলিকে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যাতে লগ্নি "জাতীয়" চরিত্রের হয়ে থাকে। সাতের দশকে অবশ্য ব্রেটন উডস সিস্টেম নামের এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, দুনিয়া মুক্ত করে

দেওয়া হয় লগ্নির অবাধ চলাচলের জন্য, বিশ্বায়নের বর্তমান পর্বের সূচনা শুরু হয়। বিশ্বায়নের এই যুগে জাতি রাষ্ট্রগুলি লগ্নির কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করার ফলে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের।

জনগণের স্বার্থ এবং লগ্নির হুকুমদারির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যা বিশ্বায়নের পুরো কার্যক্রম এবং বিশ্বায়নের পুরো জমানার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী মহামারীটির সাথে সাথে তা একেবারে প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। মহামারী চলাকালীন যখন শ্রমজীবী মানুষ লকডাউনের কারণে কর্মহীন ও রোজগারহীন হয়ে পড়েছে এবং সেইজন্য তাঁদের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে তখন পুঁজিপতিদের ওপর কর আরোপ করা বা বর্ধিত আর্থিক ঘাটতির আশ্রয় নেওয়ার পথে লগ্নির হুকুমদারি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে লগ্নির হুকুমদারি এবং জনগণের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব মহামারীটির সময় একেবারে তীব্র হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে বহু দেশ লগ্নির আদেশকে অগ্রাহ্য করেছে এবং বিশ্বায়িত লগ্নির স্বার্থবাহী নয়া উদারনীতির আগের পথ অনুসরণ করে জনগণকে সহায়তা দিয়েছে। স্পেন বেসরকারী হাসপাতালগুলিকে কোভিড-১৯ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে, যেমনভাবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। বেশিরভাগ উন্নত দেশগুলিতে জনগণের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ প্যাকেজ রয়েছে, যেগুলি বর্ধিত আর্থিক ঘাটতি বহন করছে যা লগ্নি পুঁজি দ্বারা আরোপিত সীমার থেকে অনেক বেশি। এইভাবে জার্মানি তার জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের একটি আর্থিক প্যাকেজ দিয়েছে, জাপান তার জিডিপি'র ২০ শতাংশের একটি আর্থিক প্যাকেজ দিয়েছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ধার ও ত্রাণ সাহায্য সহ একটি আর্থিক প্যাকেজ দিয়েছে যা তাদের জিডিপি'র ১০ শতাংশ। যেহেতু বেশিরভাগ দেশগুলিতে আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ বিশ্বায়িত লগ্নির স্বার্থবাহী আইনের দ্বারা সীমিত করা আছে জিডিপি'র কমবেশি ৩ শতাংশের মধ্যে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিক্রম, সেখানে এমন কোনও আইন নেই), তাই বলাই যায় যে এই আর্থিক প্যাকেজগুলি স্পষ্টতই বিশ্বায়নের লগ্নির হুকুমকে লঙ্ঘন করে করা হয়েছে।

অন্যদিকে কিছু অন্যান্য দেশ যাদের মধ্যে ভারতও রয়েছে তারা শ্রমজীবী মানুষদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্পণ্য করে

গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নামিয়েছে লকডাউন

আসছে। ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের সংখ্যা এমনকি সরকারের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুসারেও ৮ কোটি, বাস্তবে যা আরও বেশি, সম্ভবত প্রায় ১৪ কোটির কাছাকাছি, চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাত্র চার ঘন্টার নোটিসে লকডাউনের কারণে তাঁরা কর্মহীন, উপার্জনহীন ও গৃহহীন হয়ে পড়েছেন এবং রাস্তায় নেমে তাঁদের একমাত্র জানা আশ্রয় নিজেদের গ্রামের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। লকডাউন চলাকালীন কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা না থাকায় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে এবং প্রতি পরিবারকে মাসে ৭০০০ টাকা করে দিতে। পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারগুলিকেও এই সাহায্য দিতে বলা হয়েছিল কয়েক মাসের জন্য যাতে তাঁরা মহামারীর সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু সরকার সেই তুলনায় খুব সামান্যই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নয়, সমগ্র জনসাধারণের জন্য সরকারের মোট ত্রাণ ব্যয় জিডিপি'র মাত্র এক শতাংশ।

নিঃসন্দেহে এই কার্পণ্য সরকারের দিক থেকে অমানবিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু এর শিকড় রয়েছে সরকার ও বিশ্বায়িত লগ্নির অনীহার মধ্যে, জনগণের স্বার্থকে কিছুতেই লগ্নির স্বার্থের উপরে স্থান না দেওয়ার মনোভাবের মধ্যে।

সংক্ষেপে, এই মহামারীটি দুনিয়াজুড়ে সরকারগুলির কাছ থেকে দুটি বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া বের করে এনেছে। এক, লগ্নির স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সরকার জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, এবং ভারতসহ কিছু দেশের সরকার লগ্নির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

(২)

তবে এই বৈপরীত্য আমাদের সামনে কি আছে সেই সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দেয়। লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের অধীনে বিশ্বায়ন, যাকে সাধারণত নয়াউদারনীতির বিশ্বায়ন বলা হয়, এখন তা এক প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমনকি মহামারী আঘাত হানার আগেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে সঙ্কটে বাঁধা পড়েছে, সেটা কেবল একটি চক্রাকার মন্দা বা কোনো সাধারণ ঘটনা নয় যা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার সম্ভব। এটি একটি দীর্ঘ বিস্তৃত কাঠামোগত সংকট, যার উৎস বিশ্বজুড়ে আয় বৈষম্যের ব্যাপক বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে। কিংবা বলা যেতে পারে, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির আউটপুট'এ এবং স্বতন্ত্র অর্থনীতিগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অংশ বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে।

এর কারণ বিশ্বায়নের যুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। পুঁজির বিশ্বায়নের অর্থ বিশ্বব্যাপী চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত দেশগুলি থেকে তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত এশিয়ার দেশগুলিতে সবধরনের কাজের আউটসোর্সিং। এটি উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের স্বল্প মজুরীর শ্রমিকদের সঙ্গে। অন্যভাবে বলা চলে, এটি উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের ওপর তৃতীয় বিশ্বের শ্রমের মজুতবাহিনীর বিরূপ প্রভাবকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। এটি কেবল উন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেই দুর্বল করে তুলেছে না, সেখানকার শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরীতে আপাত স্থবিরতাও এনে দিয়েছে। জোসেফ স্টিগলিৎস উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন যে ২০১১ সালে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ আমেরিকান শ্রমিকের গড় প্রকৃত মজুরি ১৯৬৮ সালের চেয়ে বেশি নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা তার থেকেও সামান্য কম।

উন্নত দেশের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়েনি, তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিও বাড়েনি। এর কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্থানান্তর সেখানে বিদ্যমান শ্রম মজুত বাহিনীকে কমিয়ে ফেলতে পারে না। এর মূল দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বের শ্রম উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় অনেক বেশি, তাই এমনকি যেসব দেশে জিডিপি বৃদ্ধির উচ্চ হার দেখা গেছে, সেখানেও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার অতীতের থেকেও কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও কম। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার পাওয়া যায় জিডিপির বৃদ্ধির হার এবং শ্রম উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হারের পার্থক্য থেকে।

তৃতীয় বিশ্বের শ্রম মজুত বাহিনীকে ব্যবহার করে নিঃশেষ করতে না পারার দ্বিতীয় কারণটি হ'ল কৃষিকাজের বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাওয়া যা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়েও নিচে চলে গেছে। এই মন্দার কারণ কৃষিক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের সহায়তা প্রত্যাহার, যা বিশ্বায়নের নয়া উদারনীতির জমানার সঙ্গে জড়িত একটি ঘটনা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরগুলিতে মানুষকে স্থানান্তরে বাধ্য করেছে, এবং এর ফলে শহরের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বল্প হারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমের মজুত বাহিনীকে খুব সহজেই বাড়িয়ে তুলেছে যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। অবশ্যই শ্রমের এই মজুতবাহিনী কেবল উন্মুক্ত বেকারত্বের আকারে প্রদর্শিত হয় না, বরং কর্মসংস্থানের স্বল্পতা সব ধরণের জটিল রূপ নেয়, যার মধ্যে উন্মুক্ত বেকার ছাড়াও আধা বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব এবং অস্থায়ী কর্মসংস্থানও রয়েছে। শ্রম মজুতবাহিনীর এই জাতীয় স্ফীতি (শ্রমশক্তির তুলনায়) সংগঠিত শ্রমক্ষেত্র সহ সকল শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিতে টান বসায়।

বিশ্বায়ন এইভাবে সর্বত্র, উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও মজুরি হ্রাস করিয়ে ছাড়ে। তবে একই সঙ্গে এটা সর্বত্র শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঘটায় যা আউটপুটে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অংশ বা ভাগের বৃদ্ধি ঘটায়। আয় বৈষম্য যা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা আসলে এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ভাগ বৃদ্ধির বহিঃপ্রকাশ।

দেশগুলির অভ্যন্তরে এবং সামগ্রিকভাবে দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ভাগের এই বৃদ্ধির প্রভাবে চাহিদা হ্রাস ঘটছে। যেহেতু এটি মজুরি থেকে উদ্বৃত্তের ভাগে চলে যাচ্ছে এবং যেহেতু শ্রমজীবী লোকেরা এক টাকা আয় করলে আয়ের বেশিরভাগ অংশ ব্যয় করে, সেই তুলনায় উদ্বৃত্ত উপার্জনকারীরা এক টাকা আয় করলে আয়ের অনেক কম অংশ ব্যয় করে, তাই এই পরিবর্তনটি মোট চাহিদাকে কমিয়ে দেয়। তাই যে কোনো সময়ে সামগ্রিক চাহিদা উদ্বৃত্তের অংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যায়, যার প্রভাবে বিনিয়োগ কমে যায়, কারণ বিনিয়োগ সাড়া দেয় চাহিদা বৃদ্ধি মেপে মেপে।

এ প্রসঙ্গে সুতরাং একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সর্বমোট চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং অতএব বিশ্ব অর্থনীতির পরিমাণের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ও স্বতন্ত্র দেশগুলিতে। এই প্রবণতা সাময়িকভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয় মার্কিন অর্থনীতিতে ঝুঁকিপূর্ণ পরিসম্পদের মূল্যের ‘‘বুদবুদ’’ সৃষ্টির মাধ্যমে, প্রথমে ‘‘ডট-কম’’

বুদবুদ নব্বইয়ের দশকে এবং তারপর বাসস্থান "বুদবুদ" এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কিন্তু বাসস্থান বুদবুদ ভেঙে যাওয়ার পর, এ ধরনের কোন বুদবুদ আর প্রতীয়মান হচ্ছে না, কারণ বুদবুদ ইচ্ছামতো সৃষ্টি করা যায় না; এবং বিশ্ব অর্থনীতি এক দীর্ঘস্থায়ী বিকাশহীন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

উদ্বৃত্তের অংশ বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট বিকাশহীনতার প্রবণতাকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হতো আরও স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির মাধ্যমে, কেইনস যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি সেই ব্যয়বরাদ্দ হতো পুঁজিবাদীদের উপর কর আরোপের দ্বারা বা রাজস্ব ঘাটতির মাধ্যমে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয়বরাদ্দের এই উভয়বিধ আর্থিক পন্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নীতি বিগর্হিত, কোন রাষ্ট্র এ ধরনের চাহিদা বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ পারার পথ অনুসরণ করতে পারবে না, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই অতিরিক্ত ভীতি রয়েছে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (যেমন ট্রাম্প অনুসৃত সংরক্ষণ নীতির অনুপস্থিতিতে) এ ধরনের রাষ্ট্র পোষিত চাহিদা বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে বিদেশে, দেশে কর্মসংস্থান হবে নামমাত্র কিন্তু মার্কিন অর্থনীতির বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পাবে।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি সুতরাং কানাগলিতে প্রবেশ করেছে। তা দীর্ঘস্থায়ী বিকাশহীনতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ এই ব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবন্ধকতার কারণে। মহামারী অবশ্যই এই সংকটকে আরও গভীর করেছে, কিন্তু এই সঙ্কট শুধুমাত্র মহামারীর পরিণতি নয় বা মহামারী যখন চূড়ান্ত প্রশমিত হবে তখন অন্তর্হিত হবে। তা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলের গভীর প্রবণতাকে প্রতিফলিত করছে যার বিশ্বায়িত পুঁজির আধিপত্যের মধ্যে কোনরকম প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই।

এমনকি অর্থনৈতিক সংবাদ জগতের অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ এ সম্পর্কে সচেতন। তারা চায় অর্থনীতি তার নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড় পেয়ে নয়া উদারবাদী ছাঁদে পরিবর্তন গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সহনশীল হোক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে যা তাদের মতে অত্যন্ত চাপের মধ্যে রয়েছে। ঠিক যে রকমটা, মহামন্দার সময়কালে ১৯৩০'র দশকে কেইনস পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মেরামত করতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পথে বাতলেছিলেন। যা তখন পর্যন্ত অভূতপূর্ব ছিল, ব্যবস্থাটিকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য, এবং রুজভেল্ট এই নির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যে নিউ ডিল প্রণয়ন করেন, একইরকম মুহূর্ত, মনে করা হচ্ছে, যে আবার পুনরায় উপস্থিত হয়েছে। পুঁজিবাদ, লন্ডনের দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমসের অনুসারে, পুনরায় কেইনস – রুজভেল্ট মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছে।

শ্রমজীবী জনগণের কার্যকরী শ্রেণি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে যদি নতুন পথ, লগ্নি পুঁজির নিয়ন্ত্রণের উপর জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিকে, আরও স্থায়ীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়

২০২০ সালের ৩ এপ্রিল প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে তারা লিখছে : "গত চার দশকের বর্তমান নীতির অভিমুখ পরিবর্তনের মৌলিক অবস্থানের বিষয়টি আলোচনার মধ্যে আসা প্রয়োজন। সরকারগুলিকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই জনপরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে দায় হিসেবে নয় এবং শ্রমের বাজারের অনিশ্চয়তাকে হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পুনর্বাসন আবার আলোচ্যসূচিতে উঠে আসছে –– সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত উদ্ভট হিসেবে বিবেচিত নীতিসমূহ যেমন ন্যূনতম আয় এবং সম্পদ কর প্রভৃতিকে স্থান দিতে হবে।"

সাধারণভাবে কেউ এটাকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে "প্রভাবশালী" বিশ্বের অর্থনৈতিক সংবাদপত্র সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে এই অবস্থান, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর কারণ হলো এই যে "গত চার দশকের" নীতিসমূহ, অর্থাৎ "নয়া উদারবাদী" নীতিসমূহ লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের দ্বারা বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা স্পষ্টত ভঙ্গুর হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে, সহজাত বোধবুদ্ধিতে বোঝা যাচ্ছে যে **বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এখন থেকে প্রায় অসম্ভব।**

লগ্নি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ থেকে আচমকা দূরে সরে এসে ত্রাণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বিভিন্ন দেশে রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধির মাধ্যমে, এই প্রেক্ষাপটে গভীর তাৎপর্য বহন করে। যদিও কোভিড-১৯ সঙ্কটের জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় এই ব্যবস্থার উদ্ভাবন, তা অবশ্যই আরও স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। কিন্তু লগ্নি পুঁজি অবশ্যই তার আধিপত্য এত সহজে ছেড়ে দেবে না। শ্রমজীবী জনগণের কার্যকরী শ্রেণি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে যদি নতুন পথ, লগ্নি পুঁজির নিয়ন্ত্রণের উপর জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিকে, আরও স্থায়ীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এ প্রেক্ষিতে কারও ভুলে গেলে চলবে না যে কেইনসের চিন্তা ভাবনা ১৯৩০'র দশকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তা বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল যুদ্ধের পর লেবর সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যাদের ছিল শ্রমিকশ্রেণির বিপুল সমর্থন, এবং তাও এমন এক সময়পর্বে যখন লালফৌজের বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে। যা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ''হুমকি'' উপস্থিত করে পশ্চিম ইউরোপের দ্বার প্রান্তে।

অনুরূপভাবে, রুজভেল্টের নিউ ডিল, যা বেকারত্বকে হ্রাস করতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হলে, ক্রমশ শ্লথ হয়ে পড়ে লগ্নি পুঁজির চাপে যা ১৯৩৭ সালে পুনরায় মার্কিন অর্থনীতিকে মন্দার কবলে নিমজ্জিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহামন্দার কবল থেকে মুক্ত হয় তখনই যখন তারা সমরাস্ত্র বানাতে শুরু করে, এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটে চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, এবং তাও ঘটে সমরাস্ত্রে ব্যয়ের মাধ্যমে, বা কেউ কেউ যাকে বলেছেন ''সামরিক কেইনসীয়বাদ''। যুদ্ধের পরবর্তীকালে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়, পুনরায় সমাজতান্ত্রিক হুমকির ভয়ে।

একবার যখন উপলব্ধি করা গেছে যে শ্রমিকশ্রেণির হস্তক্ষেপ জরুরি উন্নয়নের অভিমুখ বদলের ক্ষেত্রে, এমনকি দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস'র পরামর্শ অনুসারে, তাহলে প্রত্যেককে এটা স্বীকার করতে হবে যে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে যে এ সকল দেশসমূহ কোন পথে অগ্রসর হবে : পরিবর্তিত পুঁজিবাদী পথে বা কয়েক ধাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে। আগামীদিনে শ্রেণি সংগ্রামের পথে এই বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যাই হোক এখন আমরা অন্য দেশগুলির বিষয়ে বিবেচনায় করি, ভারত সহ, যেখানে লগ্নি পুঁজির আধিপত্য থেকে নিস্তার পেতে কোনরকম উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

৩

আমাদের স্বাধীনত্তোর ইতিহাসে ভারত সরকার অন্যতম চরম মানবিকতার সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে চূড়ান্তভাবে কৃপণতার সঙ্গে দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তা করছে। এই তথ্য ইতোমধ্যে সবাই জানেন। এটা, পূর্বে উল্লিখিতভাবে, অংশত নিশ্চিতভাবে তার নিজস্ব অমানবিকতার পরিণতি। এর সঙ্গে, এটা আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির মুখোমুখি ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে। আদতে লগ্নি পুঁজি পছন্দ করে এ ধরনের শসকদেরকে, যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার নির্দেশ পালন করে থাকে, এমনকি যে সকল জনগণের প্রতিনিধিত্ব তারা করছেন বলে মনে করেন তাদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে পর্যন্ত। এটা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে দেশীয় কর্পোরেট লগ্নি পুঁজির জোট যারা বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তারা বিজেপি’কে মুক্তহস্তে সাহায্য করে থাকে, অন্য রাজনৈতিক জোটের তুলনায় তারা অনেক বেশিভাবে তহবিল প্রদান করে।

স্বাভাবিকভাবে বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির নির্দেশ অনুসারে মোদী সরকার জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, তা সম্ভবপর করছে গণতান্ত্রিক অধিকার ও সামাজিক স্বাধীনতা হরণ করার মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক বিরোধীদের ও গরিব জনগণের পক্ষে সোচ্চার ব্যক্তিদের জেলে ঢোকানোর জন্য দানবীয় আইন ব্যবহার করছে। বিচার ব্যবস্থার ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি আমরা দেশে এরকম প্রবণতা পরিলক্ষিত করছি।

যাই হোক এর সঙ্গে, যেহেতু শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের দমন পীড়নের মাধ্যমে কোন দেশে শাসক শিবিরের পক্ষে রাজনৈতিক রায় লাভ সম্ভবপর নয়, তারা অন্যভাবে তা সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য আলোচনার প্রেক্ষাপট অর্থনীতি থেকে সরিয়ে “অন্যদের” থেকে হুমকির বিষয়ে নিবদ্ধ করে, উদাহরণস্বরূপ এক হতভাগ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় জাতির সমস্তরকম দুর্দশার জন্য। এটা জনগণকে ধর্মীয় বা জাতিগত ভিত্তিতে বিভাজিত করে, সংখ্যাগুরুদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে থাকে সংখ্যালঘুদের প্রতি, এবং তার মাধ্যমে রাজনৈতিক রায় লাভের চেষ্টা করে থাকে এক ধাপ্পাবাজ সংখ্যাগুরু মনোভাবকে উত্তেজিত করার মধ্য দিয়ে। যদিও তা সংখ্যাগুরু অংশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থ

পূরণে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট থাকে না।

আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি যে মুসলিম জনগণকে একান্তভাবে চিহ্নিত করা হলো ‘‘অন্যপক্ষ’’ হিসেবে, এবং আমাদের নিজেদের দেশে হিন্দু সংখ্যাগুরু জনগণের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করা হলো। এমনকি এরকম চরম বিপদের সময়, মহামারীকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা হলো মুসলিম ষড়যন্ত্র হিসেবে বিভিন্ন হিন্দুত্বের প্রবল সমর্থকদের পক্ষ থেকে যেক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী নিজেও কোনরকম অনুৎসাহিত করার চেষ্টা করেননি। এ সবই এখানকার শাসক শিবিরের পরিকল্পনাকে প্রতিফলিত করে সংখ্যাধিক্য নির্বাচনী সহায়তা লাভের জন্য। যাতে তারা ক্ষমতায় আসীন থাকতে সক্ষম হয় এবং বিশ্বায়িত পুঁজির পদলেহনকারী নীতিসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এই দ্বিতীয় যে বিকাশ পথের রেখা কয়েকটি দেশ অনুসরণ করছে সমসাময়িক বিশ্বায়ন যে কানাগলিতে এসে পৌঁছেছে সেই প্রেক্ষিতে, তাকে আমি ফ্যাসিবাদী বিকাশের পথ হিসেবে চিহ্নিত করব। তার চিরায়ত ফ্যাসিবাদের আবশ্যিক সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, উল্লেখ করা যায় যে সমর্থন তারা লাভ করছে লগ্নি পুঁজির পক্ষ থেকে, হতভাগ্য সংখ্যালঘু জনগণের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং সামাজিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ দমনের প্রচেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে অবশ্যই চিরায়ত ফ্যাসিবাদের থেকে তাৎপর্যময়ভাবে এই ফ্যাসিবাদের ভিন্নতা রয়েছে ব্যাপক পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে। ঠিক যেরকমভাবে সমসাময়িক বিশ্বায়নকে তা পূর্বের থেকে পৃথক করেছে এবং সমসাময়িক লগ্নি পুঁজিকে তার পূর্বতন প্রতিমূর্তি থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু এই ভিন্নতা যেন কখনওই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন না করে তৃতীয় বিশ্বের বহু রাজত্বের বুনিয়াদি ফ্যাসিবাদী চরিত্র সম্পর্কে। যার মধ্যে ভারতও অন্তর্ভুক্ত, যা সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়িত পুঁজির পদলেহনে ব্যস্ত মহামারীর সঙ্কটের মধ্যেও।

৪

পরিশেষে সারসংক্ষেপ করা যাক। আমার যা মনে হয় যে মহামারীর ক্ষেত্রে একটি শাসনকালের প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা অনুমান করতে পারি নয়া উদারবাদের নিজের কানাগলিতে প্রবেশের সাধারণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে।

পূর্বতনটা আভাস অনুমান দিয়ে থাকে পরবর্তী সম্পর্কে। মহামারীর সময় আমরা যা পর্যবেক্ষণ করলাম তা থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারি দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বা বিকাশের পথরেখা, যা সাম্প্রতিককালে বিবেচনা করা হচ্ছে নয়া-উদারবাদের কানাগলি থেকে উদ্ধার পেতে অনুসরণ করার জন্য। একটা হলো কল্যাণকামী বিকাশের পথ বা কল্যাণকামী বিকাশের পথের পুনরুত্থান ঘটানো, যা "চার দশক" পূর্বে পিছন সারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়ন দ্বারা। এটা চাক্ষুষ হচ্ছে, অন্তর্নিহিতভাবে যদি না খোলাখুলিভাবে, কোনোভাবে বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজির আধিপত্যকে খর্ব করছে। দ্বিতীয়টি হলো ফ্যাসিবাদী বিকাশের পথ যা দেশকে বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের কাছে বন্ধক রেখে দেয় কিন্তু যা এই প্রক্রিয়ায় নির্মমভাবে জনগণকে দমন করে থাকে।

যাইহোক, ১৯৩০-র সময়কাল থেকে বর্তমানের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে যাকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। ১৯৩০-র দশকে, ফ্যাসিবাদী শক্তির ব্যাপকহারে সামরিক সম্প্রসারণ হওয়ার পূর্বে, সে সকল দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক ব্যয়বরাদ্দ করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। যার বেশিরভাগ পুঁজির জোগান হয়েছিল ঋণের মাধ্যমে এবং যা দ্রুততার সঙ্গে দেশগুলিকে মহামন্দার কবল থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়। জাপান ঘটনাচক্রে মহামন্দার কবল থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম দেশ ছিল, সমস্তটাই তাদের সামরিক ব্যয়বরাদ্দের ফলশ্রুতিতে। সেই পুনরুদ্ধার যাইহোক করা সম্ভবপর হয়েছিল বেশিরভাগ দেশীয় লগ্নিপুঁজির পক্ষ থেকে তোলা রাজস্ব ঘাটতির আপত্তিকে উত্তরণের মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিপুলভাবে ভিন্ন, লগ্নিপুঁজির নির্দেশের পদহেলন করার অর্থ হলো আর্থিকভাবে সংরক্ষণবাদী। সুতরাং আজকের ফ্যাসিবাদী রাজত্ব চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ তাদের নিজেদের অর্থনীতির ভিতর সঙ্কট নিরসনে। যা এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। এমনকি মহামারী অতিক্রান্ত হলেও, ব্যবস্থার সঙ্কট যা মহামারীর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল এবং যা মহামারীর কারণে অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধি লাভ ঘটবে, তাকে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী রাজত্বের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভবপর নয়।

এর একমাত্র অর্থ হলো যাইহোক এধরনের রাজেত্বের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভবপর নয়, চিরায়ত ফ্যাসিবাদের থেকে ভিন্ন, আর্থিক সাফল্যের ক্ষেত্রে। তা শুধু মহামারীর সময়কালে

নয় এমনকি মহামারী প্রশমিত হলেও। পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে আরও স্বৈরাচারী করে তুলতে বাধ্য করবে আরও শ্রমিক বিরোধী, আরও সংখ্যালঘু বিরোধী, আরও মহিলাদের বিপক্ষে, আরও নির্মম হয়ে উঠবে আগামী দিনগুলিতে, বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজির কাছে তাদের নতজানু অবস্থানের ছদ্ম আবরণকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে।

বাস্তবতা হলো এটাই যে মহামারীর সময়কালে, এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হওয়া লকডাউনের সময় যখন কোন স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ করা সম্ভবপর নয়, সেই সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতে সিএএ-বিরোধী কর্মীদেরকে জেলে ঢোকানোর জন্য দানবীয় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের আওতায়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত শ্রম আইনসমূহকে খারিজ করা হচ্ছে বিজেপি শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে, এই বাস্তবতা হলো আগামীতে কী হতে চলেছে তার ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু সঠিকভাবে যেহেতু এই রাজত্ব সঙ্কট নিরসন করা ও বেকারত্ব হ্রাস করার প্রশ্নে কোন সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হবে, তাই তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ কোনরকম নেই। এই রাজত্বের বিরুদ্ধে এবং এই বিকাশের পথের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যা এক অন্য উপসংহার নিয়ে আসবে আমাদের দেশে সমসাময়িক বিশ্বায়নের সঙ্কটের।

অনুবাদ : প্রসূন ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য চ্যাটার্জি

অর্থনীতি

কোভিড-১৯, লকডাউন ও নয়া উদারবাদ

রতন খাসনবিশ

স্টিমুলাস: যা হতে পারত

লকডাউনে জাতীয় উৎপাদন অবশ্যই হ্রাস পেয়েছে। কতটা হ্রাস পেয়েছে, সেটাও আন্দাজ করা যায়। প্রথম দুদফা লকডাউনের ৪০ দিনে জিডিপির মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৬ লক্ষ কোটি টাকা, কিছু যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানের ভিত্তিতে এই রকম একটা হিসাব করেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরজিৎ দাস। বেসরকারি ভোগব্যয়, যা জিডিপির ৬০ শতাংশ, তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে এক তৃতীয়াংশে – এই অনুমানের ভিত্তিতে হিসাবটি করা হয়েছে। সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া

হয়েছে যে আমদানি এবং রপ্তানির তফাতটুকু অপরিবর্তিত আছে আর সরকারি খরচ বাজেট নির্ধারিত হারেই করা হয়ে চলেছে। আমাদের অনুমান অধ্যাপক দাসের এই হিসাবটির যুক্তিভিত্তি যথেষ্ট মজবুত।

আয় হ্রাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে নিয়োগ হ্রাস। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির তথ্য অনুসারে গত এপ্রিল মাসেই এদেশে নতুন করে কাজ হারিয়েছেন ১২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। যদি প্রতি পরিবারে ৫ জন সদস্য থাকেন এবং তাঁর মধ্যে একজন থাকেন কর্মরত, তাহলে অনুমান করা যায় যে লকডাউনের ফলে গত এপ্রিল মাসে নতুন করে ৬১ কোটি ভারতবাসী খরচ করার সামর্থ্য হারিয়েছেন। নিয়োগহীনতা কত তীব্র এটা বোঝার জন্য এ তথ্যও যোগ করতে হবে যে, ৫০ কোটি কর্মক্ষম ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি লকডাউনের আগেই কর্মহীনতার শিকার হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দফা লকডাউনের শেষে কাজ শুরু হয়েছে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে কর্ম পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। কাজের সময় বাড়ছে, কর্মস্থলে সুযোগ সুবিধা কমছে। অনেকক্ষেত্রে লকডাউনের সুযোগে কর্মসংকোচন ঘটানো হয়েছে। স্থায়ী বেতনে যারা কর্মরত ছিলেন, সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির হিসাবে তাঁদের মধ্যে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ এই লকডাউন পর্যায়ে কর্মচ্যুত হয়েছেন। এঁদের সবাই কাজ ফেরত পাবেন না। একই সংস্থার হিসাবে, ১ কোটি ৮২ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি কাজ হারিয়েছেন। এঁদের সবাই আবার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারবেন, সে সম্ভাবনা কম। সংগঠিত কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতিও শ্রমজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক নয়। বিমান সংস্থার কর্মী, গাড়ি কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠিত ক্ষেত্রের বহু কর্মীকে লে অফ করা হয়েছে, বেতন কমানো হয়েছে প্রায় সর্বস্তরে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় কী? মনে রাখা দরকার, কোভিড-১৯এর আগেও ভারতের অর্থনীতি ভালো অবস্থায় ছিল না। সচরাচর এদেশে বেকারির হার ২ শতাংশের আশেপাশে থাকে। ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে পাওয়া গেল এদেশে সেসময় নিয়োগহীনতার হার ছিল ৬%, গত ৪৫ বছরে যা সর্বোচ্চ। পরবর্তী বছরগুলিতে নিয়োগহীনতা আরও বাড়ছিল, ২০১৯-২০ সালের শেষে প্রাক–কোভিড-১৯ পর্যায়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮ শতাংশে। অপরিকল্পিত লকডাউন দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে দিল এই

নিয়োগহীনতার হার। জরুরি ভিত্তিতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে কেন না শ্রমিক যখন শ্রমের বাজার থেকে নির্বাসনে যান একইসঙ্গে তিনি ক্রেতা হিসাবে বাজারে প্রবেশের অধিকার হারান। এঁরা কাজ হারালে পণ্যের বাজারও বিপর্যস্ত হবে, নিয়োগহীনতার বিষয়টিকে অন্তত এই দিক থেকে বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল বাজার অর্থনীতির স্বার্থেই। নীতি প্রণেতারা যে এ বিষয়টি খেয়াল করেছেন, প্রাক কোভিড পর্যায়ে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে তার প্রমাণ ছিল না। কোভিড-১৯এর আগে এদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমে আসছিল। অনুমান করা হচ্ছিল, এবছর এই হারটি নেমে আসবে ৫%এ। কোভিড-১৯ এর আক্রমণে বিধ্বস্ত অর্থনীতির বৃদ্ধির হার আরও কমবে– ১.৫% থেকে ২.৫% এর মধ্যে কোনও এক সংখ্যায় নেমে আসবে বৃদ্ধির হার বিশেষজ্ঞরা এই রকম অনুমান করছিলেন। বৃদ্ধির হারে ত্বরণ ঘটানোর জন্য কী করা যায়, সেটাও ছিল করোনা পর্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ, নিয়োগহারে বিপর্যয় রোধ করা ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করা –অর্থনীতিবিদ ও নীতি প্রণেতাদের কাছে এটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের একটা জোরালো ভূমিকা থাকবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। লকডাউনে নিয়োগহীনতার ফলে বেসরকারি ভোগব্যয় কমবে, বাজারে বিক্রি নেই দেখে উৎপাদকরা আর নতুন বিনিয়োগ করতে সাহসী হবে না, ব্যাঙ্কে আমানতের টাকা উদ্যোগপতিদের কাছে বিনিয়োগ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে– বস্তুত সেটাই ঘটেছে করোনা পর্বে। উপযুক্ত খাতক না পাওয়ায় ব্যাঙ্ক তার আমানতে পাওয়া টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অল্প সুদে জমা রাখতে বাধ্য হয়েছে। করোনার আন্তর্জাতিক অভিঘাতে রপ্তানি কমবে এবং আমদানিও কমবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। ঘটেছে ঠিক সেটাই। ভরসার একমাত্র ক্ষেত্র

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের একটা জোরালো ভূমিকা থাকবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত

হিসাবে পড়ে রয়েছে সরকারি ব্যয় যেটা বাড়লে জিডিপি চাঙ্গা হবে, নিয়োগও বাড়বে। এই রকম একটা অবস্থায় সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার একটা বড় ধরনের স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে অর্থনীতি–উদ্ধারে নামবে সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। বস্তুত মোদী সরকার প্রথম যখন ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল (যার অনেকটা অবশ্য পুরানো বাজেট থেকে নেওয়া) তখন মনে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারও এই রকমই চিন্তাভাবনা করছে।

করোনা আক্রমণ সামলে অর্থনীতিকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হলে সরকারের কত টাকা অতিরিক্ত খরচ করার দরকার ছিল? অর্থনীতিবিদদের একটা বড় অংশের অনুমান ছিল এর জন্য প্রয়োজন হবে আনুমানিক ১০ লক্ষ কোটি টাকা। টাকাটা খরচ করতে হবে স্টিমুলাস প্যাকেজ হিসাবে। কোথায় টাকা পৌঁছাতে হবে? টাকা পৌঁছতে হবে বাজারে ক্রেতাকে ফিরিয়ে আনতে। ক্রেতা থাকলে উৎপাদক অবশ্যই উৎপাদন করবে, তার কোনও বাড়তি ইনসেনটিভ বা প্রণোদনা লাগবে না। উৎপাদককে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়ার দরকারও হবে না। বাজার থাকলে ন্যায্য সুদে টাকা ধার করে উৎপাদনে নামতে ইতস্তত করবে না উৎপাদকেরা। চাই বাজার, চাই ক্রেতা। বাস্তব অবস্থা এটাই যে টাকা নেই সাধারণ মানুষের হাতে। টাকা নেই কারণ কাজ নেই কর্মক্ষম মানুষের। ক্রেতা হিসাবে বাজারে এঁরা আসতে পারছেন না। স্টিমুলাস দিয়ে এই ক্রেতাদেরই বাজারে ফেরাতে হবে। যাদের ভোগক্ষমতা কম, টাকা যেতে হবে তাদের কাছে। এঁদের হাতে টাকা গেলে সে টাকা খরচ হয়ে আরও ক্রেতা তৈরি করে। সরকারি টাকা খরচের সাধারণত ৩.৪ গুণ প্রভাব পড়ে জিডিপিতে। অর্থাৎ সরকার ১ টাকা খরচ করলে জিডিপি বাড়ে ৩ টাকা ৪০ পয়সা। এর কারণ সোজা। সরকারি টাকা যেখানে যায় সেখান থেকে প্রায় পুরোটাই খরচ হয়। স্টিমুলাসের ১০ লক্ষ কোটি টাকার বড় অংশও এই নিয়মে খরচ হওয়া দরকার ছিল। যাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম টাকা পৌঁছে দিতে হতো সমাজের সেই অংশের মানুষদের কাছে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ভোগ ক্ষমতার ভিত্তিতে যে ১০টি সামাজিক স্তরের কথা বলে থাকে, নিচের দিক থেকে তার প্রথম ৬টি স্তরে (প্রতিটি স্তরে ১০ শতাংশ উপভোক্তা রয়েছেন) যদি এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া যেত মাসিক ভোগব্যয় মেটানোর জন্য, তাহলে সেখান থেকেই বাজার চাঙ্গা হতো, বাজার চাঙ্গা হলে নিয়োগও বাড়ত, জিডিপি

বৃদ্ধির হারেও ত্বরণ ঘটত। বামপন্থীরা এই দাবি তুলেছিলেন। একটা বড় অংশের অর্থনীতিবিদ যারা ক্রেতা স্বল্পতার সমস্যা দিয়ে বাজার সঙ্কটকে ব্যাখ্যা করেন তাঁরাও এবিষয়ে সহমত হয়েছিলেন। রঘুরাম রাজন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনও এই ভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। এটা আশা করা হয়েছিল যে, এই প্রস্তাবের কিছুটা হলেও কার্যকর করা হবে করোনা উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলার স্বার্থে। সরকার এই পথে হাঁটতে রাজি হলো না।

প্রশ্ন ছিল, ১০ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য সরকারের আসবে কোথা থেকে। এ প্রশ্ন সঙ্গত প্রশ্ন সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখা দরকার লকডাউন একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতি যাতে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করতে পারলে সরকার স্বচ্ছন্দে তার খরচ করার ক্ষমতা বাড়াতে পারত। আগেই বলেছি, লকডাউনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উপযুক্ত খাতকের অভাবে আমানতের টাকা জমা রাখছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখা এই টাকা যে খাতে জমা হয় তার নাম রিভার্স রেপো খাত। এই খাতে আমানত জমা রেখে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সামান্য সুদও পেয়ে থাকে। সমস্ত এপ্রিল মাস জুড়ে উপযুক্ত খাতকের অভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে বন্যার মতো টাকা এসে জমছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ রেপো খাতে। সুদের দায় বেড়ে যাচ্ছিল দেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ রেপোর ওপরে তার দেয় সুদের হার কমিয়ে এনেছিল (৩.৭৫ শতাংশ)। এতেও পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এরপরেও টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে—ধার দেওয়ার মতো খাতক খুঁজে পাচ্ছিল না তারা লকডাউনের জন্য। মে মাসের গোড়ায় যা হিসাব, তাতে দেখা যাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই রিজার্ভ রেপো বাবদ জমা পড়া টাকার পরিমাণ ৮.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে পারত কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত স্টিমুলাস প্যাকেজের অর্থ জোটাবার জন্য। এর বাইরেও টাকা আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। বিদেশ থেকে জমা পড়া অর্থ, অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রা নয়, স্বদেশি অর্থেই লং টার্ম রেপো রিজার্ভ হিসাবে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা মজুত থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, যেটা বড় ধরনের বিনিয়োগে কাজে লাগায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। সরকারি বন্ড জমা রেখে আপাতত এই পরিমাণ টাকাও ধার করা যেত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে।

 এধরনের ঋণ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে রাজকোষ ঘাটতি

লকডাউনের মধ্যেই কাজ হারাচ্ছেন বহু সংস্থার কর্মীরা

হিসাবে দেখানো হয়। রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, ভারতীয় টাকার দাম কমবে, বিদেশি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি ভারতে টাকা খাটাতে রাজি হবে না, এরকম হরেক যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। বিষয়গুলিকে কখনই গভীরভাবে আলোচনায় আনা হয় না। যদি রিভার্স রেপোতে জমা থাকা ৮.৫২ লক্ষ কোটি টাকা সরকারি বন্ডের বিনিময়ে ধার নেওয়া হয়, এই ধারের ওপরে দেয় সুদের হার ৩.৫ শতাংশের চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়ার কথা। রাজকোষ ঘাটতি যদি বাজারকে চাঙ্গা করে জিডিপির বৃদ্ধির হারকে আগের অবস্থায় অর্থাৎ ৫ শতাংশে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে রাজস্ব বৃদ্ধির হারও অন্তত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত আসবে যা দিয়ে সুদের দায় এবং আসলের কিছু অংশ শোধ করা সম্ভব। এই হিসাবটি ভালো করে করা দরকার, রাজকোষ ঘাটতির জুজুর ভয় দেখাবার আগে।

রাজকোষ ঘাটতি হলে ভারতের ক্রেডিট রেটিং খারাপ হবে, বিদেশি পুঁজি এদেশে আসবে না– এই কথাগুলি বলার পিছনে যে যুক্তি থাকে সেটি হলো মূল্যস্ফীতির যুক্তি। মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা তখনই দেখা দেয় যখন উৎপাদনের উপকরণগুলি পূর্ণ নিয়োগ ঘটে থাকে। করোনা বিধ্বস্ত ভারতীয় অর্থনীতি এই অবস্থায় নেই। বাজারে টাকা ঢুকলেই মূল্যস্ফীতি ঘটবে না। উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কাজে না লাগিয়ে বসে আছে স্রেফ বাজারের অভাবে। স্টিমুলাসের টাকা ঢুকলে তারা উৎপাদন বাড়াবে, পণ্যের জোগান বাড়বে। মূল্যস্ফীতি ঘটবে না এই কারণে। উৎপাদকদের একটা সমস্যা হতে পারে– আবার উৎপাদন শুরু করার সময় যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগে সেই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সমস্যা। বড় উদ্যোগপতিদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা মেটাবার জন্য আছে তাদের ব্যালেন্স শিটে 'রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস'। সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে উৎপাদন শুরু করার জন্য।

সমস্যা আছে ছোট উৎপাদক, এমএসএমইগুলোর ক্ষেত্রে। তাদের পুঁজি কম, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে টাকা তাদের থাকে না। অপরিকল্পিত লকডাউনের শিকার হয়ে নিজেদের পুঁজির বেশ কিছুটা অংশ হারিয়েছেন এঁরা। যে স্টিমুলাসের কথা বলা হচ্ছিল, ওই স্টিমুলাসের একাংশ সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে না দিয়ে এই ধরনের বিক্রেতাদের কাছে আসা প্রয়োজন ছিল, তাদের যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সমস্যা, সে সমস্যা মিটত এইভাবে। সরকার যদি এদিকে মনোযোগ দিত তাহলে এদেশে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উৎপাদনের অর্ধাংশ যাদের কাছ থেকে আসে, সেই এমএসএমইরা চাঙ্গা হতো, মূল্যস্ফীতিও হতো না, স্টিমুলাস নিয়োগবৃদ্ধির ও জিডিপি বৃদ্ধির উভয় লক্ষ্য পূরণেই সফল হতো।

এই ধরনের স্টিমুলাস প্যাকেজ যে মোদী সরকারের কাছ থেকে আসবে না এটা বোঝা গিয়েছিল রঘুরাম রাজনের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর মোদী সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কে সুব্রমানিয়ামের প্রতিক্রিয়ায়। প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা এই ধরনের স্টিমুলাসকে 'ফ্রি লাঞ্চ' হিসাবে উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করেছেন। ধ্বসে যাওয়া বাজার অর্থনীতিকে আবার তার চেনা সড়কে ফিরিয়ে আনার জন্যই যে এই স্টিমুলাস অর্থাৎ যেখান থেকে লাঞ্চ আসে সেই আউটলেটটিকে সারাই করার খরচ যে এটি, এই মূল কথাটি তিনি উপলব্ধিতে আনেননি। যে অর্থনীতি মোদী এবং তার পরামর্শদাতাদের পছন্দের অর্থনীতি সেটা হলো জোগানের দিক থেকে দেখা অর্থনীতি। অর্থনীতির বহু সমস্যা যে চাহিদার দিক থেকে আসে এটা তারা উপলব্ধিতে আনেন না। বর্তমান সমস্যার উৎস নির্ধারণে নিয়োগহীনতা, জিডিপির মন্দগতি– এই সমস্ত বিষয় যে চাহিদা স্বল্পতার দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় এটা তাদের চিন্তায় নেই। কোভিড-১৯ আক্রান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার স্টিমুলাস প্যাকেজে মোদী এবং তার পরামর্শদাতারা অন্য একটি দিক খুঁজতে শুরু করলেন। জোগানের দিক থেকে সমস্যাটিকে দেখা আর সেই সূত্র ধরে কাঠামোগত সংস্কারের নামে নয়া উদারবাদী সংস্কারের বকেয়া কাজটুকু শেষ করার সুযোগ দিচ্ছে এই কোভিড-১৯, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এঁরা। কোভিড– ১৯ উপলক্ষে মোদীর দিক থেকে এল স্টিমুলাস প্যাকেজ। ৮ বা ১০ লক্ষ কোটি টাকার স্টিমুলাস নয়, ২০ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকার স্টিমুলাস। এই স্টিমুলাস ভারতীয় অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটি এবার আমরা বিবেচনা করব।

মোদীর স্টিমুলাস : নয়া উদারবাদী জুমলা

যে স্টিমুলাস শেষ পর্যন্ত এল মোদী সরকারের দিক থেকে, নিয়োগহীনতার সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষে এর চেয়ে বড় জুমলা সম্ভবত কল্পনাতেও আসে না। স্টিমুলাস প্যাকেজের পরিমাণ বিপুল। অর্থমন্ত্রী ৫ দিন ধরে সাংবাদিক বৈঠক করে তা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রস্তাবগুলিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। বলা দরকার এই ৫ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে যে টাকা বরাদ্দ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, তার আগে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ প্যাকেজে ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা ঘোষিত হয়েছিল। এর মধ্যে আবার অনেকটাই ছিল এই অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দে। গরিব কল্যাণ প্যাকেজে বাজেটের বাইরে নতুন খরচের পরিমাণ ৮৫ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতে নতুন ব্যয়বরাদ্দ ১৫ হাজার কোটি টাকা। নানা রকম করছাড়ে যা রাজস্ব ক্ষতি তার পরিমাণ ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। কাজেই নির্মলা সীতারামনের ঘোষণার আগে ১ লক্ষ কোটি টাকার কিছু বেশি ছিল সরকারি বরাদ্দ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থমন্ত্রীর প্রথম দিনে ঘোষিত ৫.৯ লক্ষ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৩.১ লক্ষ কোটি টাকা, তৃতীয় দিনে ১.৫০ লক্ষ কোটি টাকা, চতুর্থ দিনে ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা এবং পঞ্চম দিনে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থবরাদ্দে সরকারি রাজকোষ থেকে কী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হবে? জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে হিসাব করা হয়েছে সরকারি খরচ মাত্র ৩.২২ লক্ষ কোটি টাকা। বাকি সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় যে অর্থ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তারই খরচ সংক্রান্ত ঘোষণা। হিসাব করে যেটা দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ব্যয় একজোট করলে অঙ্কটি দাঁড়ায় ২১ লক্ষ কোটি টাকার সামান্য বেশি। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ টাকা বাজেটে ধার্য করা আছে। এর অর্ধেক আবার নির্মলা সীতারামনের এবছরের যে বাজেট তার মধ্যেই ধরা আছে। অতিরিক্ত খরচ তাই ওই ২১ লক্ষ কোটি টাকার মাত্র ৫ শতাংশ। বাকি টাকা স্টিমুলাসই বটে তবে সেটা আসবে নগদের জোগান বাড়িয়ে, নগদের জোগান থেকে সরকারি খাতে খরচ বাড়িয়ে নয়। বাজারে নগদের যোগান বাড়ানো, সরকারের ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রোগ্রামে টাকা বাড়ানো (যার এক পয়সাও সরকারি খরচ থেকে আসে না) আর ইনসিওরেন্স স্কিমে টাকা ধার্য করা– এই হলো ২১ লক্ষ কোটি টাকার পিছনে মোদী সরকারের অঙ্ক। যেসব

 ঘোষণায় মোদী সরকারের এক পয়সাও অবদান নেই, তার প্রথমেই

আসে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকে ঋণ দেওয়ার তহবিল। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কই এ টাকা জোগাবে, মোদী সরকার একটি টাকাও দেবে না। কিষান ক্রেডিটের ২ লক্ষ কোটি টাকা, চাষিদের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ৭০ হাজার কোটি টাকা, হকারদের ৫ হাজার কোটি টাকা, কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে ১ লক্ষ কোটি টাকা– এসবই আসবে টাকার বাজার থেকে। রিভার্স রেপোতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রেখেছিল, তার প্রায় পুরোটাই নগদের বাজারে ফেরত পাঠানো হবে, এই অর্থ বরাদ্দ করা হবে বড় শিল্পপতিদের জন্য।

মোদী সরকার এটা ঠিক মনে করে না যে, ক্রেতাদের হাতে অর্থ সরবরাহ করে বাজার চাঙ্গা করার ব্যবস্থা করার দরকার আছে। ক্রেতা নয়, বিক্রেতাদের চাঙ্গা করার জন্য অর্থবরাদ্দ করা – মোদী সরকারের ব্যয় বরাদ্দের দিশা এইটাই।

বাজার অর্থনীতির যারা সমর্থক তাদের একটা বড় অংশও নরেন্দ্র মোদীর এই কর্মসূচি অনুমোদন করেন না। ইতিপূর্বে দেখা গেছে রেপো রেট পাঁচবার কমিয়ে এনেও ঋণের বাজার চাঙ্গা করতে পারেনি মোদী সরকার। সুদের হার কমলেই উদ্যোগপতি বিনিয়োগ করতে আসবেন, অর্থনীতি এই সরল সূত্রে চলে না। মোদী সরকার ইতিপূর্বে বিপুল কর ছাঁটাই করেছিল কর্পোরেটের ক্ষেত্রে। বলা হয়েছিল, করভার লাঘব হলে কর্পোরেট আরও বেশি বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। কোনওটাই ফলপ্রসূ হয়নি। যে বাজারে ক্রেতা নেই, কোনও বিক্রেতাই সে বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহী হবে না। প্রয়োজন ক্রেতা তৈরি করা, প্রয়োজন ক্রেতাকে প্রণোদনা দেওয়া। রঘুরাম রাজন কিংবা অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি এই দিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতির আশু সমস্যাকে বোঝবার চেষ্টা করছেন। মোদী ধরেছেন উলটো পথ। করোনা উত্তর অর্থনীতিতে এর ফলে নিয়োগ এবং উৎপাদন, দুটিই বড় ধরনের ধাক্কা খাবে।

নরেন্দ্র মোদীর সরকারের আসল অ্যাজেন্ডা অবশ্য অন্য ধরনের। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে এই সরকার একটি সুযোগ হিসাবে দেখতে চাইছেন। সুযোগটা জিডিপিবৃদ্ধি অথবা নিয়োগবৃদ্ধির আশু সমস্যা সমাধানের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়নি। এটা বিবেচনা করা হচ্ছে নয়া উদারবাদী অ্যাজেন্ডার যে বকেয়া কাজ, নানা কারণে যা করে ওঠা যায়নি, এবং একটি দক্ষিণপন্থী সরকার প্রথম সুযোগেই যেটি করতে চায়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি

মানুষকে প্রতিবাদে জমায়েত হতে সুযোগ দেবে না সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের নামে। সংসদ বন্ধ থাকবে করোনার অজুহাতে। কোনও ধরনের কোনও গণতান্ত্রিক ফোরাম কাজ করতে পারবে না এই পরিস্থিতিতে। আর সেটাই সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে এই দক্ষিণপন্থী সরকার তার নয়া উদারবাদী অ্যাজেন্ডা কার্যকর করার জন্য। সাধারণ অবস্থায় একাজগুলির একটিও করা যেতে পারত না। বিষম গোলমালের যে পরিস্থিতি সেটাকেই সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে সরকার। এদেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৮০ কোটি মানুষকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে সংস্কারের বিজয় রথ চালাবে এরা।

কী দিয়ে এসব বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে এই দিয়ে যে করোনা পরিস্থিতিতে যা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অথচ আদানির কাছে যা প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক, সেই কয়লা উত্তোলনের অধিকার নির্মলা সীতারামনের ঘোষণা মতো এবার চলে যাবে বেসরকারি মালিকের হাতে। কৃষিতে বিপুলভাবে নামবে কর্পোরেট পুঁজি, ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন লঘু করে দেওয়া হয়েছে। করোনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আছে গণবন্টন প্রক্রিয়াটিকে জখম করার প্রয়াসের সঙ্গে। নির্মলা সীতারামনের ৫ দিনের বক্তৃতায় প্রতিটিতেই আছে একটি সংস্কারের ঘোষণা যে সংস্কার এত দিন করা যায়নি। কোভিডের সুযোগে যা করে ফেলা যাচ্ছে একেবারেই নির্বিবাদে।

শ্রমজীবীর ওপরে আক্রমণ আরও বেশি তীব্র হবে, শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষা আইনগুলি ক্রমশ বিপর্যস্ত হবে এদেশে। কোভিড-১৯ পরবর্তী ভারতে মুনাফার হার বাড়বে, মজুরির হার কমবে। গ্রামীণ বিপুল বেকার বাহিনীকে শান্ত রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার যোজনার বরাদ্দ ৪০ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। মোদী সরকারের ধারণা, এই সামান্য পণের বিনিময়ে তারা নির্বিবাদে নয়া উদারবাদী অ্যাজেন্ডার বকেয়া কাজটুকু অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করে ফেলবেন।

যে বিষয়টা এই নীতি নির্ধারকেরা খেয়াল রাখছেন না সেটা এই যে, যে সংস্কার তারা করতে চাইছেন, সে সংস্কার পুঁজির জন্যই কতটা মঙ্গলদায়ক তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সারা পৃথিবীজুড়ে। লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস একটি প্রবন্ধে এই অনিয়ন্ত্রিত নয়া উদারবাদী পুঁজির বদলে নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে ফেরত যাওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল করছে। ইউরোপের দেশগুলি ক্রমশ জাতিরাষ্ট্র

কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা পুনঃ উপলব্ধি করছে। নরেন্দ্র মোদী এটা মনে রাখলেও ভালো করবেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ তাদের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন নয়া উদারবাদের বিরোধিতা করার জন্য। ১৩০ কোটি মানুষের দেশে ৮০ কোটি মানুষকে বিপর্যস্ত করে যে সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর করা হবে সংসদীয় রাজনীতিতে তার অনুমোদন পাওয়া কঠিনই থেকে যাবে এদেশে। আরএসএস সম্ভবত এটা বুঝছে, হিন্দ মজদুর সভা ইতিমধ্যেই নতুন শ্রমবিধির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করেছে এরা। সবকিছুই মসৃণভাবে চলবে, নয়া উদারবাদকে অর্থনৈতিক নিয়ম হিসাবে এদেশে লাগু করার কাজে মোদী সরকার পুরোপুরি সফল হবে, পরিস্থিতি এখনও তার অনুকূল নয়।

উপসংহার

মোদীর এই প্যাকেজ এদেশের ক্রোনি ক্যাপিটাল অর্থাৎ ধান্দা পুঁজির হাত আরও শক্ত করবে। ব্যাঙ্ক মারফত যে নগদের জোগান বাড়ানো হবে এর কিছু অংশ ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি গায়েব করবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের সর্বত্র আছে আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় ধান্দা পুঁজির দখলে। এমএসএমইর সংজ্ঞা বদল করার মধ্যে দিয়ে ১০০ কোটি টাকা যাদের ব্যবসার পরিমাণ ধান্দা পুঁজির সেই নিচের অংশটিকে সহায়তা দেবার ব্যবস্থা করা হলো। এই টাকাটা আসবে যারা ২০ কোটি টাকা বা ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে তাদের বঞ্চিত করে। এদের জন্য ধার্য অর্থই লুট করে নেবে ১০০ কোটির ব্যবসার মালিকেরা। ধান্দা পুঁজি ওপরের অংশটি নগদের যা অতিরিক্ত জোগান আসবে তার সবটাই কুক্ষিগত করবে। এই টাকা উৎপাদনে ফেরত আসবে কিনা সন্দেহ আছে। টাকা যাবে বন্ডের বাজারে, আর্থিক বুদবুদ সৃষ্টি করবে এই টাকা।

এদেশে পুঁজিপতিরা প্রায় এককাট্টা হয়ে করোনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শ্রমজীবীদের ওপর আক্রমণ নামাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুঁজির সঙ্গে শ্রমের অর্থাৎ শ্রমশক্তির মালিকের যে অবিরাম গেরিলা যুদ্ধ চলে মজুরির হার এবং সেই সূত্রে শোষণের মাত্রা নির্ধারণ করা নিয়ে, রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে পুঁজির পক্ষে কাজ করতে নেমে পড়েছে কোনরকম সংকোচের বাধা না রেখে। করোনার সঙ্গে মজুরি অথবা মুনাফার কী সম্পর্ক এ প্রশ্ন করা যেতেই পারত। রাষ্ট্রশক্তি তার একটা

জবাব দিয়ে রেখেছে। করোনাকে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাবে পুঁজি আর রাষ্ট্র হবে তার ফেলিসিটেটের। রাষ্ট্রের যে শ্রেণিচরিত্র তাকে এত স্পষ্টভাবে আগে কবে দেখা দিয়েছে এদেশে? মোদীর প্যাকেজ এদেশে চলমান মন্দাকে মহামন্দায় রূপান্তরিত করবে, যাদের ভোগক্ষমতা কম তাদের হাতে টাকা পৌঁছাবার যাবতীয় রাস্তা বন্ধ করে। মহামন্দার সাথে থাকবে অতি মুনাফা। এতটা পাপের ভার ভারতবর্ষ বহন করতে পারবে কি?

শ্রমিকশ্রেণি

সামনে লড়াই

তপন সেন

সি আইটিইউ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বছরের সমাপ্তি চলতি বছরের ৩০ মে। ঐ দিনই সিআইটিইউ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সম্মেলন স্থান কলকাতায় সমাপ্তি উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রস্তুতি ছিল জেনারেল কাউন্সিল সভার প্রাক্কালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকদের জাঠা এসে পৌঁছাবে কলকাতায় এই সমাপ্তি উৎসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভয়াবহ করোনা অতিমারীর প্রকোপে চলতে থাকা লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে এই কর্মসূচিকে বাতিল করতে হয়। এছাড়া এই সময়ে করোনা সংক্রমণের

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সিআইটিইউ কর্মীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা কর্মসংস্থানহীন, বাসস্থান থেকে উৎখাত কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক, দিনমজুর, ঠিকাশ্রমিক তথা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছে তাদের সীমিত সাংগঠনিক ও আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন।

ঐক্য ও সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েই হয়েছিল সিআইটিইউ'র স্থাপনা হয়। সংগঠনের সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে আমাদের উদ্দেশ্য – শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে তীব্রতর করে শোষণমূলক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হবে আমাদের লড়াই আন্দোলন ও সমস্ত সাংগঠনিক উদ্যোগ।

প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের আহ্বান– প্রভাব ও ফলাফল

সিআইটিইউ'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলন থেকে কিছু প্রাথমিক কাজ নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের এবং সামগ্রিক ভাবে জনগণের ওপর শোষণ, বঞ্চনা, তাদের অধিকারের ওপর আক্রমণ ইত্যাদি প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিগত ৫০ বছরের সময়কালে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে ঐক্যবদ্ধ বহু সংগ্রাম, ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের লড়াইয়ের ঐক্যবদ্ধ যৌথ মঞ্চ। সংযুক্ত আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় ঐ যৌথ মঞ্চ ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বাধীন ফেডারেশনগুলি (অবশ্যই ২০১৫ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিএমএস বাদে) ঐ যৌথ মঞ্চে যুক্ত হয়েছেন। দেশব্যাপী অসংখ্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করেছে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও পাঁচ দশকব্যাপী চলতে থাকা আর্থ-রাজনীতিক পটভূমির নানামুখী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পৃষ্ঠভূমিতে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে চলে আসা রাজনৈতিক শাসনের চরিত্র সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণিকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তোলা এবং একই সাথে তাদের সামগ্রিক চেতনা ও বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য সচেতন ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে দুর্বলতাও

অনুভূত হয়ে চলেছে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের প্রতিপর্যায়ে। এর জন্য চাই সকল স্তরের কমিটি সদস্য সহ সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ভাবে সুশিক্ষিত করে তোলা। সামগ্রিক এই বোঝাপড়া, বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পর্যালোচনাকে ভিত্তি করে কেরালার কান্নুর শহরে ২০১৩ সালে সিআইটিইউ'র চতুর্দশ সম্মেলন আহ্বান জানায়, 'না পৌঁছান শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাও', 'শাসকশ্রেণি অনুসৃত নীতির নিরিখে সমস্যাবলির ব্যাখ্যা করো' এবং 'যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নীতিসমূহ পরিচালিত সেই রাজনীতির মুখোস উন্মোচিত করো'। সংগঠনের বিস্তার ঘটানো এবং এই আহ্বানকে কার্য্যকরী করার জন্য সিআইটিইউ'র চতুর্দশ সম্মেলন শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বদানকারী তৃণমূলস্তরের কর্মীবাহিনী সহ কমিটি সদস্যদের উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করে তোলার সাংগঠনিক কর্মসূচি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

সিআইটিইউ'র ষোড়শ সম্মেলনের আলোচনা, বোঝাপড়া এবং আহ্বান

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে জানুয়ারি ২০২০ সালে সিআইটিইউ'র ষোড়শ সম্মেলনে আমাদের ভবিষ্যৎ লড়াই সংগ্রামের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনার কথা। সম্মেলন লক্ষ্য করেছে যে সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিপর্যস্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার রাজনৈতিক পরিচালকরা তাদের সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধির অভিসন্ধিতে মরিয়া আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা উপলব্ধি করা হয়েছে যে গভীর সঙ্কট ও আর্থনৈতিক মন্দার সময়েও ধনিকশ্রেণির সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধির অর্থই হল গরিব শ্রমজীবী মানুষের ওপর আরও বোঝা ও তাদের অধিকারসমূহকে সঙ্কুচিত করা। এবং কার্যত তাই ঘটছে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে যার ফলশ্রুতিতে ঘটছে কতিপয় বিলিওনিয়ারের হাতে পুঁজির ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও সাথে সাথে গরিব শ্রমজীবী জনগণ দ্রুততার সাথে পরিণত হচ্ছে গরিবতর, গরিবতম মানুষে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই মরিয়া প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে নানা রূপে। মোদী সরকারের সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণায় তা নগ্নভাবে পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে। কল্যাণমূলক ও সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, গ্লোবাল হাঙ্গার

ইন্ডেক্সে ১০৫তম স্থানে থাকা সত্ত্বেও জিডিপি'র অনুপাতে খাদ্যে ভরতুকি হ্রাস করা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস, রাসায়নিক সারে ভরতুকি ছাঁটাই – প্রায় জনস্বার্থবাহী সমস্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। অন্যদিকে একই বাজেটে ও তৎপরবর্তী নানাবিধ সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসগুলিকে দেওয়া হয়েছে বহুবিধ ছাড় ও আর্থিক আনুকুল্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সরকারি কোষাগারকে লুট করার নানাবিধ উপায় – ট্যাক্স ও ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া, বৃহৎ ঋণ খেলাপিদের ঋণমকুব ইত্যাদি নানাভাবে সরকারি কোষাগার, বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেপরোয়া চৌর্যবৃত্তির প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেই নানামুখী চৌর্যব্যবস্থাকে আইনসঙ্গত করে দেওয়া।

> *লকডাউন সময়কালে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থমকে দাঁড়ানোর কারণে সম্পদ সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভূতভাবে দ্রুতগতিতে বেড়েছে মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর সম্পদের পরিমাণ*

পুঁজিবাদী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত এই পৃষ্ঠপোষিত চৌর্য-প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় ও উৎপাদেন অবনতি ও চলতে থাকা নিম্নগামিতা সত্ত্বেও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারের তুলনায় কতিপয় অর্থবানও পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটেছে অনেকগুণ। লকডাউন সময়কালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থমকে দাঁড়ানোর কারণে সম্পদ সৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে দ্রুতগতিতে বেড়েছে মুষ্টিমেয় ধনীকশ্রেণির সম্পদের পরিমাণ। দেশে উপরের তলার এক শতাংশ ধনী ব্যক্তির সম্পদ জনসংখ্যার নিচের তলার ৭০ শতাংশ মানুষের মোট সম্পদের চার গুণ বেশি – এই তথ্য থেকেই আমাদের

দেশে অশ্লীলতম অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটা পরিমাপ করা যেতে পারে; লকডাউনের দেড় মাসের সময়কালে ৬৩জন আরবপতির সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশেরও বেশি।

ইতিমধ্যেই সামগ্রিক ব্যবস্থায় এক ধরণের কুৎসিত বিকৃতির জন্ম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যখন উৎপাদন ও পরিষেবার কাজ বন্ধ থাকার কারণে সম্পদই সৃষ্টি হচ্ছে না সেই পরিস্থিতিতেও তাদের মুনাফা ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে এমনকি আরও দ্রুত গতিতে। এর অর্থ বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া জমিদার সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জাতীয় ও জনসাধারণের সম্পদের সরাসরি লুট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এবং এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শাসন পরিচালনা মুষ্টিমেয়র স্বার্থে এই পৃষ্ঠপোষিত লুন্ঠন ও চৌর্যবৃত্তির অনুসারী। আর সঙ্কট যত তীব্র হয়, লুন্ঠন ও চৌর্যবৃত্তি দ্রুততর হতে থাকে লাগাতার।

সঙ্কট গভীরতর হতে থাকার প্রক্রিয়ায়, অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থায় এই বিকৃতিকে আরও আক্রমণাত্মকভাবে প্রয়োগের স্বার্থে শাসকশ্রেণি ও তাদের রাজনীতি ফ্যসিবাদী অভিপ্রায় নিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর ওপর বহুমুখী আক্রমণ শাণিত করছে। সাথে সাথে এও মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে সমাজকে পরিচালিত করাটাও শাসক দল গৃহীত রণনীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মতবিরোধের অধিকারকে সর্বক্ষেত্রে আক্রমণাত্মকভাবে খর্ব করা হচ্ছে, এমন কি করোনা মহামারীর কারণে লকডাউনের বর্তমান পরিস্থিতিতেও চলছে অপশাসন ও বিভাজনী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে যুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিসন্ধিমূলক গ্রেপ্তার। আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিষ্ঠিত অধিকারগুলি সম্পূর্ণ নির্মূল করার দিকেই এখন তাদের নজর, গণতন্ত্রের উপর সামগ্রিক আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বে। শ্রম আইন সংস্কারের নামে সংসদে উত্থাপিত 'কোড অন অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন', 'কোড অন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশনস' এবং 'কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি' বিলগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসমূহকে কার্যত বাতিল করা যায়, ধর্মঘটের অধিকার এমনকি সংগঠিতভাবে আন্দোলন করার অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়। সরকারের চাই কর্পোরেট প্রভুদের নির্দেশানুসারে কাজের
 ঘন্টা বাড়ানো এবং একতরফাভাবে কাজের শর্তাবলী পরিবর্তন করা

বাড়ি ফেরার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের স্রোত

ও আইনানুসারে যতটুকু সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা এখনও আছে তা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা তহবিল পরিচালনার জন্য যে সমস্ত ত্রিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেওয়ার একছত্র অধিকার।

শ্রম আইন পরিবর্তনের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা থেকেই বুঝে নিতে হবে পুঁজিপতিশ্রেণির স্বৈরতান্ত্রিক ও নৃশংসতারপরিকল্পনাকে। তারা তাদের কুক্ষিগত সরকার ও অন্যান্য ক্ষমতার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণিকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায় আর এই ভাবে সংসদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিকেই প্রহসনে পরিণত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন' কোডটি মূল আইনকে পরিবর্তিত না করেই যখন তখন নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে শ্রম সময় নির্ধারণ ও পরিবর্তন করার অধিকার দিয়ে দিয়েছে সরকারের (appropriate government) হাতে। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড' সরকারগুলিকে 'যথেচ্ছ ছাঁটাই (হায়ার এন্ড ফায়ার)'-এর ক্ষমতার জন্য শিল্পে শ্রমিক সংখ্যার যে ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত আছে তা বদলে দেবার অধিকার সমর্পণ করতে চায় সরকারকে। 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন' কোডটি ইন্টার-স্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান আইনকে(১৯৭৯) বাতিল করার প্রস্তাব করেছে এবং বর্তমান লকডাউন সময়ে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্ভোগ এবং তাদের অসহায়তার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেও এই প্রস্তাবকে সরকার অব্যাহত রেখেছে। সামগ্রিকভাবে সংসদের অভ্যন্তরে কোডিফিকেশনের মাধ্যমে শ্রম আইন সংস্কারের পুরো অনুশীলনটি এমনভাবে করা হয়েছে যে সরকারিতন্ত্র যেন আইনের মূল ধারাগুলি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করার

পরিপূর্ণ অধিকার পায়। যার ফলে আইনসভা ও গণতান্ত্রিক মত বিনিময়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটিই প্রহসনে পরিনত হতে চলেছে। শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক এই পদ্ধতিটির পরীক্ষা করা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা হবে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধানের তোয়াক্কা না করে। প্রশাসন, আইনসভা ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সংবিধান নির্দেশিত ক্ষমতার যে বিভাজন আছে- যা বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি—তাকেই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নির্মূল করার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বামপন্থীরা ও সামান্য কয়েকজন ছাড়া কোনও সাংসদকেই এর বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি শ্রম সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী সমিতিতে 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড' বা 'আই আর কোড' অথবা অন্য কোনও শ্রম আইনের বিতর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান স্পষ্ট ভাবে এটাই প্রতিপন্ন করে। দুঃখজনকভাবে শুধুমাত্র বামপন্থী এবং কিছু প্রাদেশিক দলের এক-আধজন প্রতিনিধির, (তাও কখনও কখনও), ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক দল বর্বর কর্তৃত্ববাদ পরিচালিত আর্থরাজনীতিক প্রশাসনের এই বিকৃত অনুশীলনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

রাজনীতির পরিমণ্ডলে নয়া উদারবাদী পুঁজিব্যবস্থার প্রভাবসম্ভূত এই পরিস্থিতি শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সামনে নিয়ে আসছে আগামী দিনের আসল চ্যালেঞ্জের স্বরূপকে। ভরসার কথা, এই চরম বিপ্রতীপতার মধ্যেও দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু রূপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে। বিরাষ্ট্রীয়করণ, শ্রম আইন সংস্কার, UAPA আইনের পরিবর্তন, মত বিরোধের অধিকার বা ধর্মঘটের অধিকার সহ শ্রমিকশ্রেণির অন্যান্য অধিকার খর্ব করার প্রসঙ্গে বামপন্থী ও একআধজন প্রাদেশিক দলের প্রতিনিধিরা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের সামান্যতম বিরোধিতা না থাকলেও রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে দেশের প্রায় সমগ্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ধারাবাহিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে অসংখ্য ধর্মঘট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণির সমস্ত ঘৃণ্য ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও ফেডারেশনগুলির যৌথ মঞ্চ প্রণীত দাবিসমূহের সনদটি দেশ ও জনগণের অবাধ লুণ্ঠনকারী কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে এক বিকল্প অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশ করেছে। বর্তমান

সময়ে শাসকশ্রেণির আক্রমণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে জাতীয় তথা তৃণমূল স্তরে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটাই এখন আশু প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় খেটে খাওয়া অন্য অংশের মানুষ যেমন কৃষক, খেতমজুর, স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষজনসহ জনগণের অন্যান্য অংশকে সাথে নিয়ে তাদের দাবিকেও প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ষোড়শ সম্মেলনের আহ্বান – সংগ্রামের পর্যায় – আক্রমণ ও প্রতিরোধ

প্রধানত এই বোঝাপড়া ও বিশ্লেষনের ভিত্তিতে সিআইটিইউ'র ষোড়শ সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন দেশে এক নতুন পর্যায়ে– "অস্বীকার ও প্রতিরোধের" (ডিফারেন্স এ্যাণ্ড রেজিস্ট্যান্স) আশু প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। আইন বদলে দিলেও, শ্রমিকশ্রেণি তাদের ধর্মঘটের অধিকার বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অধিকারের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নিতে পারে না, মানবেও না। এ জাতীয় সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার ও অমান্য করে আমাদের আন্দোলন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে হবে এবং তা অবশ্যই সর্বনিম্ন ও জাতীয় উভয় স্তরেই সংগঠিত করতে হবে। সংগঠিত অবাধ্যতার ঢেউ তুলতে হবে ব্যাপকভাবে। জাতীয় সম্পত্তি দেশি বিদেশি ব্যক্তি মালিকের হাতে বিক্রয় করে দেবার পথ বেয়ে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণের আগ্রাসী প্রচেষ্টা, বিলগ্নিকরণ, দেশের খনিজ সম্পদকে বেসরকারী খননের জন্য ইজারা দেওয়া, ভূমিসম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা বৃহৎ কর্পোরেটের স্বার্থে আমূল বদলে দেওয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে তৃণমূল ও জাতীয় উভয় স্তরেই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই নতুন পর্যায়ে তৃণমূল স্তরে প্রতিরোধের ক্ষমতা আরও গভীরতর এবং ব্যাপকতর করার কাজকে প্রাথমিকতা দিতে হবে।

ষোড়শ সম্মেলন থেকে উদ্ভূত এই কেন্দ্রীয় কাজটি সিআইটিইউ'র 'না পৌঁছানোর কাছে পৌঁছান', 'ইস্যুগুলিকে গৃহীত নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করা' ও 'নীতিসমূহের পেছনে রাজনৈতিক চরিত্রকে উন্মোচিত করা'র আহ্বানের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতাকেই পুনস্থাপিত করছে।

কোভিড ১৯ মহামারী- লকডাউন- অভিজ্ঞতা

সিআইটিইউ'র সুবর্বজয়ন্তী বছরের সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছানোর পর্বে আমরা করোনা মহামারি এবং সেই কারণে ৪৫+ দিনের লকডাউন প্রক্রিয়ার ও তৎসঞ্জাত দুর্বিষহ ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন। সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের জন্য অভিজ্ঞতাটি ভয়াবহ, চরম যন্ত্রণা ও বেদনা দায়ক। তবে একই সময়ে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই ৪৫+ দিনের লকডাউনের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক শিক্ষাও দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ILO'র অনুমান অনুসারে করোনা মহামারীর প্রকোপে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অর্ধেক অংশই তাদের জীবিকা হারানোর ঝুঁকির সম্মুখীন। সেন্টার ফর মনিটারিং ইকনমি'র অনুমান অনুসারে এই লকডাউন সময়ে দেশে প্রায় ১৪ কোটি মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়েছেন।

করোনা মহামারীর জন্য লকডাউন পরিস্থিতিতেও দেশে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণি ও তাদের রাজনীতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যকলাপের মরিয়া প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, করোনা মোকাবিলায় নয়, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশিবিদেশি পূঁজিপতি প্রভুসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে। সরকারি ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক শক্তিই শুধু নয়, তাদের প্রভু পুঁজিবাদের বর্বর, ফ্যাসিবাদী ও অমানবিক চেহারা ফুটে উঠছে সর্বত্র। মুনাফা বজায় রাখতে তারা মানবজীবনকে ব্যবসায়িক বিনিময়ের মাধ্যম বানাতে, প্রয়োজনে বলি দিতে বা জাতীয় সম্পত্তি নয়ছয় করতেও দ্বিধা করে না, আর এই উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক নিয়মাবলীকে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে দেওয়ার নীলনকসা তৈরির কাজও তারা করে চলেছে। প্রশাসনের পুরো পদ্ধতিটি আরও আগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রীকরণ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের সুযোগ নিয়ে মোদী সরকার ও তার নিযুক্ত বিশেষ গোষ্ঠী অগ্রাহ্য করছে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের দায়বদ্ধতা, দমন করছে নাগরিক স্বাধীনতা এবং এমন কি প্রেস সেনসরশিপ লাগু করার ক্ষমতাও কুক্ষিগত করেছে। আপতকালীন এই বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে শাসকশ্রেণি এবং রাজনৈতিক প্রশাসন তাদের মুনাফা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত করতে চাইছে।

এটা বোঝা দরকার যে কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই মাত্র চার ঘণ্টার নোটিসে দেশের মানুষের ওপর লকডাউন চাপানো কোনও প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়। অন্যান্য সমস্ত দিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে

অগ্রাহ্য করে সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এবং সাথে সাথে জনসাধারণকে চরম বিভ্রান্তি ও অসহায়ত্বের বাধ্যতায় নিক্ষেপ করার এ ছিল এক স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির পটভূমিতে মহামারী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং শ্রমিকশ্রেণির অধিকার সঙ্কুচিত করার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের চরম দুর্দশার বিনিময়ে শোষকশ্রেণির মুনাফা বৃদ্ধির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যেই পরিচালিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে শাসকশ্রেণির বিশেষ ক্ষমতায়ন ।

শ্রম আইন পরিবর্তনের জন্য সংসদে আলোচনার অপেক্ষা না করে, লকডাউন উদ্ভূত বিধিনিষেধও তৎসঞ্জাত প্রায়-নিশ্চলতার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কার্যনির্বাহী আদেশনামার মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার ও সুরক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়ার এই বেপরোয়া প্রচেষ্টা আসলে দ্রুততার সাথে ধনিকশ্রেণির স্বার্থে অবাধ শোষনের অধিকার ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত শাসকশ্রেণির নারকীয় কৌশলকেই প্রতিফলিত করছে।

আটটি রাজ্যে দৈনিক শ্রমঘন্টা ১২ ঘন্টা করার প্রশাসনিক আদেশনামা এবং বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রচলিত সব শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশনামা আসলে লকডাউন সময়ের সুবিধাগুলিকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করার এক নোংরা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না। শোনা যাচ্ছে গুজরাট, আসাম, কর্ণাটক ও ত্রিপুরার সরকারগুলিও একই পদ্ধতিতে অর্ডিন্যান্স জারির পথে। একই ধরনের নৃশংস পদক্ষেপ গ্রহণের পথে বেশির ভাগ রাজ্যই অগ্রসর হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এবং এই ক্ষেত্রে মোদী সরকারের কৌশলটি হল প্রথমে তার নিয়ন্ত্রনাধীন সরকারগুলির মাধ্যমে এই কাজ কিয়ে নেওয়া এবং পরবর্তীতে অন্য সরকারগুলিকে চাপে রেখে একই পদ্ধতি অনুসরণে বাধ্য করা। ধনিকশ্রেণি ও

সঙ্কট যত বৃদ্ধি পাবে ততই ভয়াবহ ভাবে বাড়তে থাকবে শ্রমিকশ্রেণির অধিকারের ওপর আক্রমণ

রাজনীতির প্রাঙ্গণে তাদের প্রতিনিধিদের মুনাফা সুনিশ্চিত করার এই কৌশল নোংরামির চরম স্তরে নেমে যাতে পারে। সঙ্কট যত বৃদ্ধি পাবে ততই ভয়াবহ ভাবে বাড়তে থাকবে শ্রমিকশ্রেণির অধিকারের ওপর আক্রমণ, যে কোনও উপায়ে, যে কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করে ধনিকশ্রেণির মুনাফা বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখতে শাসনযন্ত্র আরও নোংরা ও নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহৃত হবে। এবং এ কথা স্পষ্ট যে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণি রাজনৈতিক শাসনযন্ত্রের এই অমানবিক ও নৃশংস পদ্ধতিকে পুরোপুরি মদত যুগিয়ে চলছে এবং এখনও পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় পেছনে রয়েছে দেশের প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলসমূহ কার্যত নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকায়।

এছাড়াও, কর্পোরেট মালিকানাধীন মিডিয়া হাউসের সহায়তায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার সব রকম অপপ্রয়াস, জালিয়াতি, প্রতারণার কোনও সুযোগকেই ছাড়ছে না ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক শক্তি। ২০২০ সালের ১২ মে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে প্রধাণমন্ত্রী স্বনির্ভরতার বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। ২০১৪ সালের পর থেকে এই মোদী সরকারই প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগতভাবে কাজ করে গেছেন। লাগামহীন বেসরকারিকরণ, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উদার প্রয়োগ এবং কয়লা খনন, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, রেলওয়ে পরিবহণ ও উৎপাদন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমনকি লঘু প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রের অনিয়ন্ত্রিত বানিজ্যিকরণ হয়েছে তার সময়কালেই, পাশাপাশি লক্ষ্য করা গেছে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলির স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ঔষধ শিল্পকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। সব ক্ষেত্রেই লাভান্বিত হয়েছে বিদেশি কোম্পানিগুলি আর দেশের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে বারে বারে প্রচার করে জনগণের উপর প্রতারণা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা স্থাপিত হয়েছে আলোচ্য সময়ে।

ইতিবাচক অভিজ্ঞতা– তৃণমূল স্তরে অসাধারণ উদ্যোগ

লকডাউনের সময়কালে আমাদের অনেক ইতিবাচক অভিজ্ঞতাও হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদের আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা লক্ষ লক্ষ দুস্থ অনাহারক্লিষ্ট মানুষের পাশে পৌঁছে গেছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। এটি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিকারী এক অভিজ্ঞতা।

আমাদের সংগঠনের তৃণমূল স্তরে এবং বহুক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে বিশাল উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের কর্মকাণ্ড নিজের কর্মস্থল ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পরিবারের সদস্যরাও জড়িয়ে পড়েছেন এই কর্মযজ্ঞে। সহকর্মী ও জনগণের সাথে অভূতপূর্ব সংহতির এই অনুভূতিকে সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে যা শ্রেণি আন্দোলনকে আরও প্রশস্ত ও সুসংহত করার এক অভাবনীয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

সংগঠনের নিম্নস্তরে এই ধরনের ব্যাপক উদ্যোগ ব্যতিত দুঃস্থ অনাহারক্লিষ্ট মানুষ বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ কার্য সংগঠিত করা যেত না। লকডাউনের ফলশ্রুতিতে চাকরি হারানো উপার্জনহীন, আশ্রয়হীন পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারগুলির বর্বর আচরণ ও অমানবিক সংবেদনহীনতার কারণে তাদের অকল্পনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সিআইটিইউ এই সমস্ত দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছিল লকডাউনের শুরুতেই। এই আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া মিলেছে এবং এই উদ্যোগ সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও আমরা আমাদের নিজস্ব সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই সমস্ত মানুষের মাত্র একটি অংশের কাছেই পৌঁছাতে পেরেছি। তথাপি লকডাউনের মাঝে আমাদের নেতাকর্মীদের চলাফেরার উপর নানা বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমরা যে পরিমাণে চরম দুর্দশাগ্রস্ত বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি তা ছিল আমাদের প্রত্যাশা ও সামর্থ্যের বাইরে। এবং এটি সম্ভব হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ব্যাপক শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার কারণে। সংগঠিত এই ত্রাণকার্যে আমরা ঠিক কতজনের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি বা কি পরিমাণে ত্রান বন্টন করতে পেরেছি তার সঠিক পরিমাপ এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। কিছু কিছু রাজ্যে আমাদের সংগঠকরা ত্রাণ হিসাবে অনেকের হাতে খাদ্যসামগ্রীসহ সামান্য অর্থও তুলে দিয়েছেন, কোথাও কোথাও রান্নাকরা খাবার খাওয়ানোর জন্য সংগঠিত করা হয়েছে কমিউনিটি কিচেন। রিলিফের কাজ আজও চলছে বিভিন্ন স্থানে। অনুমান করা যেতে পারে যে আমরা সমস্ত রাজ্য মিলিয়ে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এপ্রিলের শেষদিন পর্যন্ত অন্তত ২০ লক্ষ দুঃস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি।

এই প্রসঙ্গে, আমাদের অবশ্যই কেরালার বাম গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে হবে। জনদরদি এই সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক পরিবারগুলির হাতে ত্রাণ ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়। বিপরীতে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগের প্রতি কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির অমানবিক আচরণ ও নির্মম অসংবেদনশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উপার্জন ও আশ্রয়হীন পরিযায়ী শ্রমিকদের কেরালা সরকার ‘অতিথি শ্রমিক’ বলে অভিহিত করেছেন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান দিতে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছেন। এই কর্মকাণ্ডে সেখানে সিআইটিইউ তার সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে ত্রাণসামগ্রী ও সাহায্য পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ও দুস্থ পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ ও রাজ্য সরকারের ত্রাণকার্যের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তাছাড়া গত ২১ এপ্রিল ২০২০ সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে ‘ভাষণ নহি রেশন চাহিয়ে, বেতন চাহিয়ে, সুরক্ষা চাহিয়ে’ সিআইটিইউ’র এই আহ্বানে দেশব্যাপী বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। বহু জায়গায় পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে শ্রমিকরা অংশ নিয়েছেন এই কর্মসূচীতে। তৃণমূল স্তরে আমাদের কর্মী বাহিনীর এমন কি সাধারণ শ্রমিকদের বিশাল উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। লকডাউনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সিআইটিইউ এই কর্মসূচি পালনের আহ্বানকে সোশ্যাল মিডিয়া সহ নানাবিধ উপায়ে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছিল এবং তৃণমূল স্তরের নেতা কর্মীদের অভাবনীয় উদ্যোগ ছাড়া এই কর্মসূচি সফল করে তোলা সম্ভব হত না। অন্যভাবে বলতে গেলে এই কাজের মাধ্যমে সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত আমাদের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানো গেছে এবং তা সংগঠনের ও সামগ্রিক ভাবে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্র ও তৎসম্বন্ধীয় দাবিসনদ ছাড়িয়ে আমাদের সংগঠন দ্বারা অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের সংগঠন, ছাত্র-যুব-মহিলাদের সংগঠনগুলির সাহায্য সমর্থন নিয়ে বিভিন্ন জ্বলন্ত সামাজিক ও জনগণের সমস্যা, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব। সম্ভবত সিআইটিইউ’র এই

কর্মসূচি সাম্প্রতিক কালে গৃহীত সর্ববৃহত এক কর্মসূচি, সমস্ত রাজ্য ও ফেডারেশন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে আবাসিক এলাকা, কর্মক্ষেত্র, অফিসগুলিতে, বাজার এলাকা, দোরগড়ায় প্রায় সর্বত্র অল্প সংখ্যায় একত্রিত হয়ে দাবি সম্বলিত পোস্টার , প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন ও স্লোগান দেওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশের ৪০৭টি জেলায় ৬০,৩৫১টি স্থানে ৪,১৬,৫৭৫ জনের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। একইভাবে এ বছর সারা দেশব্যাপী মে দিবস পালিত হয়েছে আরও অনেক বেশি সংখ্যক স্থানে ও অনেক বেশি মানুষের উপস্থিতিতে।

এ ছাড়াও লকডাউন পিরিয়ডে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্য ও জেলাস্তরে নানাবিধ উদ্ভাবনী উপায়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ দেখা গেছে। এবং অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রচলিত সব শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশনামা তথা আটটি রাজ্যে দৈনিক শ্রমঘণ্টা ১২ ঘণ্টা করার প্রশাসনিক আদেশনামার বিরুদ্ধে অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচিই "না পৌঁছানোদের কাছে পৌঁছানোর" ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করে বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এই সম্ভাবনাকে আগামী দিনে সচেতনতার সাথে পুরোপুরি কাজে লাগানো দরকার এবং এর পাশাপাশি শাসকশ্রেণি অনুসৃত নীতির নিরিখে সমস্যাবলীকে ব্যাখ্যা করা এবং যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এই নারকীয় নীতিসমূহ পরিচালিত হচ্ছে সেই রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করার কাজগুলিও করে যেতে হবে।

আগামী দিনের কাজ

নয়া উদারবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবাদে উদ্ভূত সঙ্কটের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ওপর শাসকশ্রেণির নামিয়ে আনা হামলার বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করার প্রস্তুতি নেওয়াটাই আমাদের সামনে আগামী দিনের কাজ। সঙ্কট যতই গভীর হচ্ছে, হামলার ধরন হচ্ছে আরও নিষ্ঠুর, আরও বর্বর। তাই লড়াই আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে এবং সেজন্য চাই শ্রমজীবী জনগণসহ সাধারণ মানুষের ব্যাপকতম ঐক্য এবং শ্রমিকশ্রেণিকেই ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে।

এবং তার জন্য আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বলিয়ান হয়ে সাংগঠনিক ভাবে আক্রামক অবাধ্যতার উচ্চতায় আন্দোলনকে উন্নীত করার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। লকডাউনের সময়ে আমাদের কর্মী বাহিনীর সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ বন্টন, যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সংগঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনে অভিনব উপায়গুলিকে একত্রিত করে নতুন অংশের মধ্যে আমাদের সমর্থনের প্রসার ঘটাতে হবে। এর সাথে আমাদের সামনে আগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য কর্মক্ষেত্র-স্তরে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার সামর্থ অর্জনে সক্ষম হতে হবে।

নতুন পরিস্থিতি দাবি করছে যে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন অবশ্যই হবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নিত এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই এবং এটিই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির অনুসরণ করার সঠিক পথ। লকডাউন সময়কালে গৃহীত কার্যক্রমের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের আত্মবিশ্বাস দেয় যে আমরা একসাথে সংগঠিত ভাবে এ কাজ করতে পারি, করা সম্ভব।

উপরোক্ত পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলন, প্রচারাভিযান ও সাংগঠনিক কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। নয়াউদারবাদী নীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজনীতির অমানবিক হিংস্র পাশবিক চেহারা এবং যুগপদ চরম সুবিধাবাদী অবস্থান প্রত্যক্ষ করে চলেছে আপামর জনগণ লকডাউনের চরম দুর্দশা ও নিঃস্বতা ও স্বজনহারানোর বেদনাকে বুকে নিয়েই। এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার আলোকেই সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ ও পূজিবাদী রাজনীতিক দর্শনের অমানধিক হিংস্রতা ও চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের স্বরূপকে উন্মোচিত করতে হবে জনচেতনায়– শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেণিসচেতন ধারার সামনে এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা ধারাবাহিক নিরন্তরতার সাথে চালিয়ে যেতে হবে। নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার আক্রমণের মোকাবিলার প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা শ্রেণি আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চকে ব্যাপকতম করতে হবে তৃণমূলস্তরে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের লড়ে যাওয়ার ঐক্যে উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে। নয়া উদারবাদী নীতির বিকল্প পথের দিশা দেখানোর সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে প্রচার আন্দোলনের আমাদের নিজস্ব স্বাধীন কর্মসূচি এবং অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে। বিকল্প পথের সন্ধানকে শুধুমাত্র শ্রমিকদের বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, শ্রমজীবী

মানুষের বৃহত্তম ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে যুক্ত করতে হবে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রদের সমস্যা, অব্যাহত কৃষি সঙ্কটের প্রেক্ষিতে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ও সরকারি কল্যাণমূলক পরিসেবা ক্ষেত্রগুলির আউটসোর্সিং সম্পর্কিত সমস্যার কথা এবং সামাজিক উৎপীড়ন, নারী ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়গুলি।

আমরা করবো জয় নিশ্চয়।

অনুবাদ: নিশীথ চৌধুরি

কোভিড ১৯ লকডাউন, কৃষিক্ষেত্রের দুর্দশা এবং প্রতিরোধ

বিজু কৃষ্ণান

বিশ্ব আজ এক অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির মুখোমুখি। যা প্রতিটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে। কোভিড ১৯ মহামারী সম্ভবত ভারতকেও সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের কিনারায় এনে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ, কৃষক, খেতমজুর এবং শোষিত অংশের মানুষ শুধু যে ভাইরাসের শাসানির মুখোমুখি তা নয়, তাঁরা জীবনজীবিকা ও আয় হারানোর বিপদ এবং বেকারত্ব, দারিদ্র ও ক্ষুধা-অনাহারের মুখোমুখি। লক্ষ লক্ষ কাজ হারা মানুষ তাঁদের কাজের জায়গা ছেড়ে

নিজেদের গ্রামে পালিয়ে আসছেন। দেশভাগের পর থেকে এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসার ঘটনা আর দেখা যায়নি। পালিয়ে আসার সময় শতাধিক শ্রমিক দুর্ঘটনায়, অনাহারে প্রাণ হারিয়েছেন, দুর্দশার কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এমন নজিরবিহীন মানবিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে শাসকশ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাঁদের নিজেদের ভরসাতেই ছেড়ে দিয়েছে এবং এই সঙ্কট নয়া উদারবাদী সংস্কারগুলোকে আরো আগ্রাসীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেরা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বলে সানন্দে দাবি করতে শুরু করেছে। 'হয় এখন, নয়তো কখনই নয়', 'আমরা আর কখনই এরকম সুযোগ পাবো না, একে কাজে লাগাও' সোচ্চারে একথা বলে শ্রম বাজারের সংস্কার, অনেকগুলো আইন স্থগিত করে দেওয়া, শিল্পগুলির সামনে লাগামহীন নমনীয়তা ও বাজার সংস্কারের সুযোগ করে দেওয়া এবং কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছেন নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত। নয়া উদারবাদের পরামর্শ নিষ্ঠার সাথে মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও দফায় দফায় নানা প্যাকেজ ঘোষণা করে চলেছেন। নয়া উদারবাদী নজিরগুলোর হয়ে প্রকাশ্যে সওয়াল করতো এমন দেশগুলোও সাথে বাকি প্রায় সমগ্র বিশ্ব যেভাবে এই সঙ্কটের মোকাবিলা করছে তার তুলনায় বিজেপি সরকার একেবারে ভিন্নতর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর আগে কখনো, কোভিড ১৯-য়ের মতো মহামারী তার ক্ষতি করার ক্ষমতা এভাবে জাহির না করলেও, তারা নয়া উদারবাদের নজিরগুলোকে আরো আগ্রাসীভাবে অনুসরণ করার জন্য সওয়াল করে যাচ্ছে।

লকডাউনের কবলে বর্তমান কৃষিব্যবস্থা

লকডাউনের তিনমাস আগেই কোভিড মহামারীর বিপদের কথা জানা গিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্বেও দেশ যে আসন্ন বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছে তা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে কিংবা পরিকল্পনা করতে এই সময়টাকে ব্যবহার করা হয়নি। তার বদলে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি-কে ব্যবহার করে দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্ররোচনা ছড়ানোর জন্য এবং দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার মাধ্যমে দেশে মেরুকরণ ঘটানোর জন্য বিজেপি সরকার এই মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি বোলসোনারো এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়াটাই ছিলো বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার। বিশ্ব যখন এই

মহামারীকে মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে তখন আহমেদাবাদে 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং ঘোড়া কেনাবেচা করে মধ্যপ্রদেশের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়াটাই বিজেপি নেতৃত্বের যাবতীয় অগ্রাধিকার দখল করে ছিলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো একের পর এক সতর্কতা জারি করলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কিন্তু কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এই সময়টাকে ব্যবহার করা উচিত ছিলো। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা জন্য সমস্ত রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটা দৃঢ় পরিকল্পনা গড়ে তোলাও ছিলো জরুরি। কিন্তু ভারত সরকার এই সঙ্কটকে লঘু করে দেখেছিলো এবং কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই দেশের উপর লকডাউন চাপিয়ে দিয়েছিলো।

গম, কিছু এলাকায় ধান, লঙ্কা, বরবটি, ছোলা, সরষে, নানা ধরনেরডাল, তুলো, ভূট্টার মতো নানা রবি শস্য এবং তার সাথেই সবজি ও ফল চাষের মরসুমও লকডাউনের প্রথম পর্যায়ের মধ্যে পড়ে গেলো। এই অপরিকল্পিত লকডাউন এর ফলে চাষবাস এবং তা বাজারজাত করার প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আর যে কৃষকরা আগে থেকেই সঙ্কটের মধ্যে ছিলেন তাঁদেরকেও আরো চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিলো। কৃষক, খেতমজুর অথবা গ্রামীণ কারিগর ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) যে সম্ভব নয়, তা সারা ভারত কৃষকসভা শুরু থেকেই বলে আসছিলো। স্পষ্ট ভাবে বললে, এই লকডাউন তাঁদের থেকে রুটিরুজি, বছরভরের শ্রম ও বিনিয়োগ, খেতের ফসল ও কর্মসংস্থান ছিনিয়ে নিয়েছে, আয় নষ্ট করেছে এবং বড় সংখ্যক মানুষকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছে। খেতের ফসল যদি বাঁচানো না যায় তবে তাঁদের পরিশ্রম এবং পুঁজি তো নালা দিয়েই ভেসে যাবে। কৃষকরা তাঁদের জন্য লকডাউনে ছাড় দিতে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। কেরালা সরকার ধানচাষকে জরুরি পরিষেবা বলে ঘোষণা করেছিলো এবং চাষের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলেও জানিয়েছিলো। নষ্ট হয়ে যাবে এমন আরো কিছু শস্যচাষে সেচ দিতে মজুরদের কাজে লাগানোর জন্যও তারা অনুমতি দিয়েছিলো। অন্যদিকে, এমন কিছু সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রচুর সময় নষ্ট করেছিলো, ফলে তা কার্যক্ষেত্রে আর ফলপ্রসূ হয়নি।

> *গত বছর এই সময়ে সমান সংখ্যক দিনে বাজারে যা গম এসেছিলো এবারে তার মাত্র ৬ শতাংশ বাজারে এসেছে*

চাষবাস, কৃষকদের সাহায্য করা ও পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য শ্রমিক না মেলায়, পণ্য পরিবহন ও যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ থাকায়, লকডাউন কার্যকরী করতে প্রশাসনিক বাড়বাড়ন্তের কারণে, খাদ্যশস্য সংগ্রহে বাধা তৈরি হওয়ায়, কৃষিপণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সমস্যা হওয়ায় এবং বাজার ও মান্ডিগুলো খোলা ও সেখানে যাতায়াতের প্রশ্নে বিধিনিষেধের কারনে চাষবাস ও তা বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এই সঙ্কট তৈরি হলো। যখন কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে গমের ফলন হবে এবং অন্যান্য রবি শস্যের চাষও ভালো হবে বলে আশা করছিলেন ঠিক সেই সময়েই লকডাউন শুরু হলো। গত বছর যেখানে ২৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের ফলন হয়েছিলো সেখানে এবারে ৩৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের ফলন হয়। প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছিলো গমের চাষ। কোভিড ১৯ লকডাউনের ফলে কৃষি বাজার ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছিলো তা অধ্যাপক প্রফেসর বিকাশ রাওয়াল এবং অঙ্কুর ভার্মা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমান দিয়ে তুলে ধরেছেন। ১৩৩১টি মান্ডি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, কোভিড লকডাউনের প্রথম ২১দিনে বাজারগুলিতে যে কৃষি পণ্য এসেছে তা গত বছর এই একই সময় বাজারে আসা পণ্যের তুলনায় অনেক কম। গত বছর এই সময়ে সমান সংখ্যক দিনে বাজারে যা গম এসেছিলো এবারে তার মাত্র ৬ শতাংশ বাজারে এসেছে। ছোলা এবং সরষের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি সমান শোচনীয়, যে দুটি ফসল এই সময়েই চাষ হয়েছে। তুলনা করে দেখা গেছে, গত বছর এই সময়ে বাজারে যে পরিমাণ আলু এসেছিলো তার মাত্র ৪১ শতাংশ এবং পেঁয়াজের মাত্র ৩০ শতাংশ এবারে বাজারে এসেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে পাওয়া রিপোর্টে দেখা গেছে, ৫৫ লক্ষ টন গম সংগ্রহের লক্ষমাত্রা নিয়ে চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে সেখানকার বিজেপি সরকার ৫৮৩১টি ক্রয় কেন্দ্র

খুলেছিলো। যদিও ২২ দিন পরে দেখা গেলো, একটি ক্রয় কেন্দ্র গড়ে মাত্র ৩৩ জন কৃষকের থেকে গম কিনেছে, অর্থাৎ প্রতিদিন ২জনেরও কম কৃষকের থেকে গম কেনা হয়েছে। এর থেকে যে তিক্ত সত্যটি উঠে এসেছে তা হলো, এখনো শস্য পুরোপুরি চাষ হয়নি এবং যেটুকুই বা চাষ হয়েছে তার পুরোটা মান্ডি বা বাজারে পৌঁছাচ্ছে না।

দুধ, মাছ, সবজি, ফল এবং ফুলের মতো সহজে নষ্ট হয়ে যায় এমন জিনিসেরও বিকিকিনি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবাদি পশুর খাদ্য এবং পোলট্রির পশুপাখির খাদ্যও কৃষকদের কাছে পৌঁছায়নি। দুধের দামও পড়ে গিয়ে লিটার প্রতি ১০ থেকে ১৫টাকায় দাঁড়িয়েছে। টমাটোর দামও কেজি প্রতি ২টাকার বেশি উঠছে না। আঙুর চাষিরা হিসাব করে দেখেছেন শুধু মহারাষ্ট্রেই তাঁদের ১০০০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হবে। মধ্যপ্রদেশে গমের দাম কমে কুইন্টাল প্রতি ১৬০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। কেজি প্রতি ৮০ টাকা থেকে কমে মুরগির দাম কেজি প্রতি ২৫ টাকা হয়েছে। রাজস্থানে সরষে এবং ছোলা বিক্রি করে যেখানে কুইন্টাল প্রতি ৪৮০০ টাকা পাওয়া যেত সেখানে এখন মাত্র ১০০০ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। গবাদি পশু এবং পোল্ট্রির খাবারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরবর্তী মরশুমের জন্য বীজের আকাল ও শ্রমিকের ঘাটতি প্রাক খারিফ ধান, ভূট্টা, রাজমা এবং রবি ও খারিফ মরশুমের মাঝে অল্প সময়ে যে সব ফসল চাষ হয় সেই সব ফসল চাষের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি করেছে। অনেক জায়গায় কৃষকরা ফুলকপি, গাজর, খরমুজ, ফুল এবং আঙুর চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। রেশমচাষীরা রেশম গুটির ক্রেতা পাচ্ছেন না। সঙ্কটে থাকা চট শিল্পের শ্রমিক ও কৃষক, ছোট চা চাষী এবং তাঁদের সাথে বাগিচা শ্রমিকরাও সবাই চরম দুর্দশার মধ্যে। শ্রমিকের অভাব আখ চাষ, ডালকল, চালকল এবং এ'ধরনের অন্য কাজকর্মগুলোর ক্ষেত্রেও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। আদিবাসী মানুষের এলাকায় অপুষ্টি, অনাহার এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলির ঘাটতি তো ছিলোই, তারই সাথে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেটুকু মধু, মহুয়া, কেন্দুপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করা যেতো সেটুকুও সম্ভব না হওয়ায় তাঁদের ঘাড়ে অতিরিক্ত সমস্যা চেপে বসেছে। একইসঙ্গে এসব জিনিস বাজারজাত করার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বঞ্চনার শিকার হওয়া একটি প্রান্তিক অংশের মানুষ তাঁদের কষ্টের রোজগার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। অসময়ের বৃষ্টি,

লকডাউনে পড়ে থাকছে টন টন আলু

এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো গবাদি পশু এবং বন্য জন্তুও এই সময়ে খেতের ফসল নষ্ট করেছে। লকডাউনের কিছুটা সহজ হলে খেতের যেটুকু ফসল বাঁচলো তার অভাবী বিক্রিটাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। চাষবাস এবং ১০০ দিনের কাজে (এমজিএনআরইজিএ) খেতমজুররা বঞ্চিত হয়েছেন। লকডাউন বলবৎ করার আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনার অভাবেই এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

পরিকাঠামো গড়ে তুলতে, পরিষেবা দিতে, শহরের এলাকাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং আরো নানান কাজ করতে যাঁদের মহান ভূমিকা রয়েছে সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অস্তিত্বের কথাই যেন বিজেপি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ, রিকসা-অটো-ট্যাক্সি চালকের কাজ, সবজি ও ফল বিক্রেতার কাজ এবং অন্যান্য অনেকেই ঠেলা গাড়িতে করে পথে পথে হকারি ইত্যাদি করেন। তাঁদের একটা বড় সংখ্যাই হয় কৃষি পরিবার থেকে এসেছেন অথবা তাঁরা কৃষক কিংবা খেতমজুর, যাঁরা ফাঁকা সময়ে শহরে আসেন এবং কিছু রোজগার করেন। তাঁরা রুটিরুজির সন্ধানে ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে যেতে এবং মৌলিক প্রয়োজনগুলো ছাড়াই জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁদের অনেকের কাছেই কোনো নথি এবং রেশন কার্ড নেই। রোজগারের এই জায়গা ছেড়ে বিপুল সংখ্যায় তাঁদের ফিরে যাওয়া এবং তাঁদের জন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকার কারণে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে তাঁদের নিজ ভূমেই মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে উদ্বাস্তুদের মতো পালাতে হচ্ছে।

অনেকেই ভিন রাজ্যগুলিতে অসহায় অবস্থায় পড়েছেন এবং কাজ ছাড়া, খাবার ছাড়া দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে ১৬জন শ্রমিকের রেললাইনে মৃত্যু, উত্তরপ্রদেশের আউরাইয়ায় পথ দূর্ঘটনায় ২৬জন শ্রমিকের মৃত্যু, এরসাথে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার সময় অনাহারে আরো ৪০০জনের মৃত্যু, দুর্দশার কারণে আত্মহত্যা এসবই তাঁদের জীবনে লকডাউনের শাস্তি হিসাবে নেমে এসেছে। এইসব শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকার অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধের দায় এড়াতে পারেন না।

কৃষক ও খেতমজুরদের দাবিগুলি

অর্থনৈতিক মন্দা এবং লাগাতার কৃষি সঙ্কটের এই সময়ে দীর্ঘ মেয়াদী লকডাউন কৃষক, খেতমজুর এবং মেহনতি মানুষের জীবনে নিঃসন্দেহেই আরো দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলেছে। দারিদ্র, বেকারি, অপুষ্টি এবং ক্ষুধা আরো ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিড়ম্বনার বিষয় হলো, আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য মজুত থাকা প্রয়োজন, ৫০০ লক্ষ টন চাল এবং ২৭৫ লক্ষ টন গম সহ তার তিন গুন খাদ্য মজুত থাকা সত্বেও আমাদের ব্যাপক ক্ষুধার এমন পরিস্থিতির সাক্ষী থাকতে হলো। কর্পোরেটদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে জনগণকে যে রক্ষা করা যায় না, তার জন্য জনগণের মৌলিক বিষয়গুলির উপরে জোর দিতে হয়, তা আজ স্পষ্ট। রাজ্যগুলিকেই সামনে থেকে কোভিড ১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্যগুলির জন্য অবিলম্বে অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত ছিলো। লকডাউনের জন্য শস্য এবং আয়ের যে ক্ষতি হয়েছে তা অবশ্যই মেটাতে হবে। কৃষক ও মেহনতি মানুষের আয়ের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিবেচনা করে যাঁরা কর দেন না, ভারতের যত গরিব মানুষ তাঁদের সবাইকে মাসে কমপক্ষে ৭৫০০ টাকা করে দিতে হবে (এ আই কে এসের কেন্দ্রীয় কমিটি বিষয়টিকে সংশোধন করে মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে)। ভূমিহীন, ছোট ও মাঝারি কৃষিজীবী, ভাগচাষী এবং খেতমজুরদের ধারবাকি অবিলম্বে মকুব করতে হবে এবং তাঁদের আর কোনো ঋণ শোধ করতে হবে না বলে ঘোষণা করতে হবে। সহজে নষ্ট হয় এমন ফসল সহ সমস্ত ফসল এবং দুধ, ডিম, মাংসর মতো খামারজাত পণ্যগুলির জন্য সি ২ (কমপ্রিহেনসিভ কস্ট বা মোট খরচ) + ৫০% সূত্র অনুসারে লাভজনক দাম দিতে হবে

এবং তা সংগ্রহ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তী মরসুমের জন্য বিনামূল্যে বীজ, সামর্থ থাকবে এমনদামে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ এবং বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার মূল্য বাড়িয়ে বছরে ১৮ হাজার টাকা করতে হবে এবং সমস্ত ভাগ চাষী এবং আদিবাসী কৃষককে এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। লকডাউন পর্বে বিক্রি করতে দেরি হওয়ার কারনে এবং রবি চাষে যে ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এম জি এন আর ই জি এ-র কাজে বেকার ভাতার ধারা অনুসারে সমস্ত খেতমজুরকে দিন প্রতি ৩০০ টাকা অথবা রাজ্যের ন্যূনতম মজুরির মধ্যে যেটা বেশি হবে সেটাই দিতে হবে। কেরালার উদাহরণ অনুযায়ী সবাইকে খাদ্যশস্য ছাড়াও রান্নার তেল, চিনি, ডাল, চা, নুন, মসলাপাতি ইত্যাদির মতো সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দিতে হবে। মাথাপিছু কমপক্ষে ১০কেজি করে চাল বা আটা এবং পরিবার পিছু ৫কেজি করে ডাল, এটাই হলো দাবি। এই দাবিগুলি ছাড়াও হিমঘরের মতো পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন এবং সমবায়গুলির মাধ্যমে বাজারজাতকরণের উপর জোর দিতে হবে। বুনিয়াদি কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিকে রক্ষা করতে হবে। খাদ্য সংগ্রহ এবং বাজারজাত করার প্রক্রিয়ার সাথে যে শ্রমিকরা যুক্ত তাঁদের নিরাপত্তার উপর জোর দিয়ে নিরাপত্তার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিতে হবে। এগুলিই হলো মূল দাবি।

অপরাধমূলক প্রত্যাখ্যান, মিথ্যা এবং প্রতারণায় এক ক্ষতিকারক কর্মসূচী ফাঁস হয়ে গেলো

বেশ কিছু দিন ধরে বিজেপি সরকারের সবকিছু অস্বীকার করার কর্মপদ্ধতি এবং অপরাধমূলক অবহেলাই এই সঙ্কটকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে শুধু নাটুকেপনাই ছিলো এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে তিনি থালা বাজানো, বাতি জ্বালানো, উপর থেকে ফুল ছড়ানো এসবের কথাই বলে গেছেন। সঙ্কট মোকাবিলার জন্য রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে বিশেষ অর্থিক সহায়তা, খেতের ফসল রক্ষার জন্য স্পষ্ট আশ্বাস এবং লাভজনক দামে তা সংগ্রহ করা, রোজগারের ক্ষেত্রে সহায়তা করা, সাথে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া সহ সমস্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে লকডাউনের আগেই একটি প্যাকেজ

ঘোষণা করা উচিত ছিলো। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান যোজনায় ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন বলে নির্বাচনের আগে প্রচুর প্রচার চালানো হয়েছিলো। কিন্তু যখন সত্যিই কিছু করা প্রয়োজন তখন দেখা গেলো সংখ্যাটা ৮ কোটি ৭০ লক্ষে দাঁড়িয়ে। হাতের এক ভেল্কিতে ৬কোটি কৃষক উধাও হয়ে গেলেন। যাঁরা এই তালিকায় ঢুকতেই পারেননি সেই ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষীদেরই বা কি হবে? যে ২০০০ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে তার কোনো কিছুই কৃষকের জন্য নয় এবং কোভিড লকডাউনে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা মোকাবিলা করার জন্য কোনো বিশেষ বরাদ্দও সেখানে নেই। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যান যোজনায় ২০ কোটির বেশি রেশন কার্ডের গ্রাহক কোনো রেশনই পাননি। এমনকি ১ কেজি করে ডাল দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো তা কেবলমাত্র ২০শতাংশ উপভোক্তার কাছে পৌঁছেছে। ১০০ দিনের (এমজিএনআরইজিএ-র) কাজে নামমাত্র ১২ টাকা মজুরি বেড়েছে, যদিও লকডাউনে কাজের সুযোগ মারাত্মক ভাবে কমেছে। ঋণগ্রস্ত কৃষকের কোনো ঋণই মকুব করা হয়নি, অথচ মেহুল চোসকি, বিজয় মালিয়ার মতো ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে যেখানে পেট্রো পণ্যের দাম সবচেয়ে কমেছে সেখানে বিজেপি সরকার পেট্রোলের ক্ষেত্রে ১০টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে ১৩টাকা অন্তঃশুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। যখন চাষের খরচ বাড়ছে তখন সারেও ভরতুকি ছাঁটাই করা হয়েছে।সঙ্কটের সময় এমন মাত্রায় চূড়ান্ত ঔদাসীন্য দেখানোটাই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> *প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে শুধু নাটুকেপনাই ছিলো এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে তিনি থালা বাজানো, বাতি জ্বালানো, উপর থেকে ফুল ছড়ানো এসবের কথাই বলে গেছেন*

নয়া উদারবাদী পথ-মানচিত্রের যে রূপরেখা নীতি আয়োগের সিইও তৈরি করেছিলেন, কোনো রকম দেরি না করে তা উন্মোচিত হলো। মূলমন্ত্র হলো 'সংস্কার', যা কিছু করা হলো তা শ্রমিক, কৃষক এবং গরিবের স্বার্থের পরিপন্থী। কষ্ট করে অর্জিত শ্রমিকের অধিকারগুলিকে রাজ্য সরকারগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলো, কাজের সময় বাড়িয়ে দিনে ১২ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৭২ ঘন্টা করে দেওয়া হলো, বেসরকারি বাজারকে সুবিধা পাইয়ে দিতে কৃষি পণ্যের বাজার কমিটি (এমপিএমসি)-র আইনকে লঘু করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হলো এবং খামার-পণ্যের বাজার থেকে সব নিয়ন্ত্রন সরিয়ে নেওয়া হলো, মডেল ঠিকা চাষ আইন ২০১৮, মডেল প্রজাসত্ত্ব আইন অথবা কৃষি জমি লিজ আইন কার্যকরী করা হলো, কর্পোরেটগুলো যাতে কৃষিজমি কবজা করতে পারে এবং একই সাথে যাতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ করা যায় তার জন্য ভূমি সংস্কার আইনকে উলটে দেওয়া হলো। আর কখনই এমন সুযোগ পাওয়া যাবে না, এমন এক আতঙ্কের তাগিদ থেকেই যাকে 'বৃহৎ, সাহসী, পরিকাঠামোগত সংস্কার' বলা হয় তা বাস্তবায়িত করার জন্য বিজেপি, কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো।

কেউ কেউ দেশের অর্থমন্ত্রীর কৃষি প্যাকেজকে প্রশংসা করে '১৯৯১ সালের কৃষি মূহুর্ত'-র সাথে তুলনা করলেও এবং এটা পরিযায়ী শ্রমিক, হকার, স্বনির্ভর মানুষ, ছোট কৃষক এবং গরিবের স্বার্থবাহী বলে লম্বাচওড়া দাবি জানালেও, তা চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। গত তিন মাস ধরে আমরা বারে বারে যে উদ্বেগের কথা জানিয়ে আসছি সে সম্পর্কে সেখানে কোনো উচ্চবাচ্যই করা হলো না। বিজেপি সরকার ন'টা পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলো- পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তিনটি, রাস্তার হকারদের জন্য একটি, আবাসনের জন্য একটি, আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি, কৃষকদের জন্য দু'টি। এই অংশের মানুষের দুর্দশা কমানোর জন্য এটা একটা সার্বিক পদক্ষেপ বলে একটা মনোভাব তৈরির চেষ্টা করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার কিছুই হলো না, এর মাধ্যমে সঙ্কটের সমাধানও হলো না। এর মধ্যে অনেকগুলো পদক্ষেপই চালু কর্মসূচীকে ঘষে মেজে নতুন বলে চালানোর চেষ্টা অথবা নতুন বোতলে সেই পুরানো মদ পরিবেশনের চেষ্টা ছিলো। কোভিড লকডাউনের ফলে আকস্মিকভাবে যে সঙ্কট

 তৈরি হলো তাকে সেই মতো মোকাবিলার কোনো পদক্ষেপই এর মধ্যে

ছিলো না। যাঁরা একে কৃষিক্ষেত্রের জন্য ১৯৯১ সালের সাথে তুলনা করছিলেন, তাঁরা ভুলে গেছেন যে এই পদক্ষেরগুলোই তীব্র কৃষি সঙ্কট তৈরি করে দিয়েছে, চাষের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে, কৃষক লাভজনক দাম পাচ্ছেন না, পাশাপাশি ঋণের বোঝা এবং দুর্দশা ৪ লক্ষের বেশি কৃষককে আত্মহত্যা করার পথ বেছে নেওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, হকারদের সংগঠনের মতো সংগঠনগুলি এবং বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে বারে বারে দাবি জানানোর সময় বিজেপি সরকার ঘুমিয়ে থাকলেও অনেক দেরিতে ভাবমূর্তি তৈরির প্রয়োজন বুঝতে পেরে প্রথমে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করলো এবং তার পর কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমগুলির সাহায্যে প্রচার শুরু হলো। কিন্তু কৃষক এবং খেতমজুরদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে কোনো ঘোষণাই করা হলো না। কৃষক সমাজ, গরিব এবং মেহনতি মানুষের কথা বলে তারা আসলে যে অভিনয় করছিলো তার মুখোশ খুলে দেওয়া প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্যাকেজ বলে অর্থমন্ত্রী যা ঘোষণা করেছিলেন তা কৃষক সমাজের সাথে আরো একটি বড়সড় বিশ্বাসঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষক, খেতমজুর এবং আয়কর দিতে হয় না এমন গরিব মানুষদের জন্য মাসে ৭৫০০ টাকা করে দেওয়া, ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রেহাই দেওয়ার জন্য ব্যপকভাবে ঋণ মকুব, সি-২+৫০% সূত্র অনুসারে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে সমস্ত ফসল কিনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া এবং এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে দিন প্রতি ৩০০টাকা মজুরিতে ২০০দিনের কাজ, একই সাথে লকডাউন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার দাবিগুলি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই ওই প্যাকেজে নেই। ফসল নষ্ট হওয়ায় কাজ হারিয়ে কৃষক ও খেতমজুররা যে রোজগার হারালেন তার ক্ষতিপূরনের বিষয়েও কিছু করা হলো না। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় কৃষকরা প্রায় ৮০০০ কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছেন বলে যে দাবি করা হচ্ছে তা কেনো ভাবেই লকডাউন পর্বের ক্ষতির জন্য নয়, আগের বকেয়া মেটানোর জন্য এই টাকা খরচ করা হয়েছে, যার বড় অংশের প্রিমিয়ামই আবার কৃষক ও রাজ্য সরকারগুলি মিটিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আরো বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে ব্যবসার জন্য খাদ্য মজুতের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে অর্থমন্ত্রী ১৯৯৫ সালের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য

আইন সংশোধন করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে কৃষকরা আগের চেয়ে বেশি দাম পাবেন বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আদতে এর ফলে খাদ্য মজুত করাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে এবং সরকারে পক্ষেও জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। পেঁয়াজ, আলু, তৈলবীজ, খাবার তেল এবং খাদ্যশস্যের দামের বিনিয়ন্ত্রণ এবং তার সাথে মজুতের সীমা তুলে দেওয়ার কারণে জাতীয় বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় খোলা বাজারে কেবলই জিনিসের দাম বাড়বে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের আকাল দেখা দেবে এবং কৃষকরাও কোনো সুবিধা পাবেন না। এরফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার সাথেও আপস করা হবে। কৃষি পণ্যের আন্তঃরাজ্য বানিজ্য, ই-ব্যবসাকে উৎসাহিত করা এবং কৃষি-ব্যবসাকে বিনিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও কর্পোরেটদের মুনাফা কামানোর সুবিধা করে দিতে কৃষি পণ্যের বাজার কমিটি (এমপিএমসি)-র আইনকে লঘু করে দেওয়ার মতো বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে রাজ্যের অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ করার উপরেও জোর দেওয়া হবে। স্পষ্টতই এক দেশ, এক বাজার স্লোগানকে সামনে রেখে অবাধ বানিজ্যের বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষকের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কৃষি-ব্যবসা এর সুবিধা ভোগ করবে।কৃষি পণ্যের বাজার কমিটিগুলি উপেক্ষিত হবে এবং রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা বিলোপ করা হবে। সহায়ক মূল্য এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক সমাজকে সার্বিক ভাবেই কৃষি ব্যবসার কর্পোরেটদের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। এটা হলো একটি আগ্রাসী নয়া উদারবাদী প্যাকেজ, যা অনাহার, দুর্দশা এবং অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকা কৃষক সমাজ এবং গ্রামের গরিব মানুষের উপরেই আক্রমণ নামিয়ে আনবে। সঙ্কটের এই সময় লকডাউনের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য কৃষক সমাজ যখন উদগ্রীব তখন তা নিয়ে এই প্যাকেজে কোনো টুঁ শব্দ না করে বলা হচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে খাদ্য সংগ্রহে অর্থ ব্যয় করা করা হবে। গম এবং অন্যান্য রবি শস্য যে খুব কম পরিমাণে বাজারে আসছে সেই তথ্যটাই আসলে আড়াল করা হচ্ছে এবং অর্থমন্ত্রী খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রশ্নে নির্লজ্জের মতা মিথ্যা বলে চলেছেন।

নয়া উদারবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের সংকট চলছে এবং বেশিরভাগ দেশ মন্দার মধ্যে রয়েছে, সেখানে অসাম্য ও বেকারত্ব-ও বেড়ে চলেছে। কোভিড

১৯ মহামারী নয়া উদারবাদী মডেলের ভঙ্গুর দশাকে যেভাবে তুলে ধরেছে ততটা আগে কখনও ঘটেনি। নয়া উদারবাদের দৃষ্টান্তগুলির ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্র কর্পোরেট মুনাফার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। জনস্বাস্থ্যের সুবিধাগুলো নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে এবং চালু প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করা হচ্ছে। বেসরকারিকরণের তাবড় সমর্থকরাই এখন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাগুলির জাতীয়করণের কথা বলছেন। কোভিড ১৯-য়ের ফলে যাদের শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো সেই স্পেন সমস্ত হাসপাতালকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। মোদ্দা কথাটা হলো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জাতীয়করণের অ্যাজেন্ডাকে আমাদের আরো জোরের সাথে তুলে ধরতে হবে। তা সে স্বাস্থ্য পরিষেবা হোক কিংবা শিক্ষা, তার সহজে মেলাটাই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তা অবশ্যই সহজলভ্য হতে হবে। সংহতির মাধ্যমে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শোষিত মানুষের ঐক্যগড়ে জনস্বার্থবাহী একটি বিকল্প গড়ে তোলার জন্য সমস্ত শক্তি একসাথে করার উপরেই আমাদের জোর দিতে হবে। সরকারি ব্যয়বরাদ্দে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষার সাথে সবার জন্য রেশন ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলি সুস্পষ্ট থাকবে, এমন একটা বিকল্প। বিজেপি সরকরের অসংবেদনশীল ভূমিকার বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ এবং শ্রমিকশ্রেণি গত ২১শে এপ্রিল ব্যাপক প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছে। লকডাউন পর্বে এটাই ছিলো প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিবাদ। শ্রেণি এবং গণ সংগঠনগুলিও তাদের নিজেদের সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে এই প্রতিবাদের শরিক হয়েছিলো। গোটা দেশে ১০লক্ষের বেশি মানুষ শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৬ই মে সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ২৫০টি বেশি সংগঠন সমস্ত রাজ্যগুলিতেই প্রতিবাদ জানান, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ নেন। শ্রমিকের অধিকারের উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ১৩ই মে শ্রমিকরাও প্রতিবাদ জানান। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ২২শে মে জঙ্গি প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হয়, তারপর সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় গত ২৭শে মে। শাসক শ্রেণি যে আগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক সহ সমস্ত শোষিত মানুষের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়তে হবে। আমাদের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের অধিকারগুলিকে রক্ষা করবো।

অনুবাদ: সত্যেন সরদার

যারা প্রতিরোধ করেছে

দেবাশিস চক্রবর্তী

করোনা ভাইরাস শুরু হয়েছিল চীনে, প্রথম প্রতিরোধও হয়েছে চীনেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর সঙ্গীসাথীরা, চীন-বিদ্বেষী মহল চীনকেই মহামারী ছড়ানোর জন্য দায়ী করলেও তা শুধু অবৈজ্ঞানিকই না, বাস্তবতা থেকে শত যোজন দূরে। পুঁজির কেন্দ্রগুলির বিধ্বস্ত অবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, সংক্রমিত ১৮ লক্ষের কাছাকাছি। ইউরোপ কেঁপে উঠেছে। মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থনীতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু চীন পেরেছে, ভিয়েতনাম পেরেছে, কিউবা পেরেছে। এশিয়ার অসুস্থ মানুষ। এই

ছিল চীনের তকমা, গণ সাধারণতন্ত্র তৈরি হবার আগে। মাও জে দঙরা যখন নয়া চীন তৈরি শুরু করছেন তখন দেশের গড় আয়ু মাত্র ৩৫। সব মিলিয়ে ৩৬৭০ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ৫ লক্ষ ৪১ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী। ৮৫ হাজার বেড। এই বিশাল দেশের বিপুল অংশেই চিকিৎসা পৌঁছয় না। গভীর দারিদ্র্যে ডুবে থাকা চীনকে অন্ধকার থেকে টেনে তুলতে জোর দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও। প্রতিষেধে জোর দেওয়া হয়েছিল, পিছিয়ে থাকা এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচার চালানো হয়েছিল, গড়ে তোলা হয়েছিল চিকিৎসার সরকারী পরিকাঠামো। জনগণের অংশগ্রহণে চিকিৎসা কাঠামো গড়ে তোলায় নতুন পথ তখনই দেখিয়েছিল চীন। মাওয়ের বেয়ারফুট ডক্টরদের কথা বিশ্ব জানে। তাঁরা গ্রামে গ্রামে যেতেন, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি শেখাতেন, ভ্যাকসিনেশনের কাজ করতেন। বস্তুত, এখন অনেকেই ভুলে মেরে দেবার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু সেই সমায়ের চীনে বেশ কয়েকটি রোগের ভ্যাকসিনও আবিষ্কার হয়।

তার পরেও চীনে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঘাটতি ছিল। বিপুল জনসংখ্যার দেশে সরকারী পরিকাঠামো পৌঁছে দেবার ঘাটতি ছিল। ১৯৭৮ সালে সংস্কারের পর্ব শুরু হবার পরে ধীরে ধীরে সরকারী কাঠামো ছাড়াও বহু রূপের ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ফার্মাসিউটক্যাল শিল্পে জোর দেওয়ার জন্য বিনিয়োগ, মেডিক্যাল শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগ শুরু করা হয়। ১৯৯৬-এ প্রথম স্বাস্থ্য পরিষেবা বৈঠক থেকে ঠিক হয় জোর দেওয়া হবে গ্রামীণ ক্ষেত্রে আর রোগ প্রতিরোধে। ১৯৯৮-এ চালু হয়ে যায় শ্রমিকদের জন্য সামাজিক মেডিক্যাল স্বাস্থ্য বিমা। ২০০০-এ শহরে চালু হয় সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা। অর্থাৎ, ন্যায্য মূল্য দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া। ২০০৩-এ চীনকে এক মহামারীর মুখে পড়তে হয়। সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্স ছড়িয়ে পড়ে। এই লড়াইয়ে চীন জেতে। তবে, চিকিৎসা কাঠামোর অনেকগুলি ঘাটতি থেকে শিক্ষাও নেয়।

বড় মোড় নেয় ২০০৯-এ। মেডিক্যাল শিক্ষা থেকে চিকিৎসায় সংস্কার একটি নতুন রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে। ডিপেনিং রিফর্মস অন মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথকেয়ার সিস্টেমস দলিলে স্পষ্টই বলা হয় মৌলিক মেডিক্যাল ও চিকিৎসা পরিষেবা সরকারী পণ্য হিসাবেই সকল নাগরিকের কাছে আসবে। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনো

লাভ করার প্রশ্ন থাকবে না। সব বিষয়েই চীনের নীতিনির্ধারকরা সংখ্যা দিয়ে নামকরণ করতে পছন্দ করেন। এবারে তা হলো 'চার ব্যবস্থা': জনস্বাস্থ্য, মেডিক্যাল পরিষেবা, মেডিক্যাল নিরাপত্তা, ওষুধ সরবরাহ। এই চারটি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য পরপর কয়েকটি পদক্ষেপও নেওয়া হয়। বস্তুত তারপর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জোর বাড়ানো হয়েছে, আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছানো, উন্নততর গবেষণায় রাষ্ট্র সংগঠিত ভাবে প্রয়াস নিয়েছে। দ্বাদশ পরিকল্পনার অন্যতম অংশই ছিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি।

মাওয়ের বেয়ারফুট ডক্টরদের কথা বিশ্ব জানে। তাঁরা গ্রামে গ্রামে যেতেন, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি শেখাতেন, ভ্যাকসিনেশনের কাজ করতেন

এর সুফল পেয়েছে চীন। ২০১৯-র একটি দলিল জানাচ্ছে, ২০২১৬-র হিসাবে গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৫। ১৯৯০-এও প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল প্রতি লক্ষে ৮৮.৯; ২০১৬-তে তা কমে দাঁড়ায় ১৯.৯। শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১৯৮১-তে হাজারে ৩৪, তা ২০১৬-তে দাঁড়িয়েছে ৭.৫। এই সূচকগুলির সবক'টিই আরো উন্নত হয়েছে গত চার বছরে।

চীনে জোর দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতিতে, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে, জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে। এখন ৯,৮০,০০০ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এখানেই একটি কথা বলে নেওয়া ভালো। চীনে ১২ হাজারের বেশি সরকারী হাসপাতাল ছাড়াও ১৬ হাজারের বেশি বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে। ১ কোটি ১০ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। ৭০ লক্ষ শয্যা রয়েছে সরকারী হাসপাতালেই। চীনে ভ্যাকসিন এখন বিনা পয়সায়, শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই পান। ভ্যাকসিন দেবার হার অন্তত ৯০ শতাংশ। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সাফল্য অর্জন করেছে চীন। যেমন, চীনে নবজাতকের টিটেনাস হয় না, হেপাটাইটিস বি ১ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, যক্ষা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রার থেকে

অনেক ভালো ফল অর্জন করেছে। যক্ষার ৯০ শতাংশের বেশি সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এইডস তলানিতে নেমে এসেছে। ম্যালেরিয়ার মত রোগ গত কয়েক বছরে গোটা দেশে হচ্ছে ৩ হাজারের ধারেকাছে। এক সময়ে চীনে ম্যালেরিয়ার প্রাদর্ভাব ছিল মারাত্মক রকমের।

অন্যদিকে, চীন এই সময়কালে বিশ্বের বৃহত্তম মেডিক্যাল বিমা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে। কঠিন অসুখে অসুস্থ মানুষের জন্য বিশেষ বিমা রয়েছে। এবং, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী চিকিৎসা পরিষেবা পাবার নিশ্চয়তার বিমা রয়েছে। তার ফলে চীনে চিকিৎসা পাওয়া যাবেই, এই গ্যারান্টি রয়েছে। চীনে বেসরকারী চিকিৎসা কাঠামোও রয়েছে। কিন্তু মূলত রাষ্ট্র চিকিৎসার দায়িত্বে। তার ফল হল এইডসের মত অসুখ, বা দ্রুত ছড়াতে থাকা কোনো সংক্রমণে দ্রুত চিকিৎসা মেলে। বড় ও দীর্ঘস্থায়ী অসুখে অসুস্থদের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিলেনিয়াম গোল সময়ের আগেই অর্জন করতে পেরেছে চীন। এই সবই কাজে লেগেছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায়।

চীনে মহামারী মোকাবিলার ব্যবস্থা সব সময়ের জন্যই প্রস্তুত। মহামারীর মত অসুখ ও জরুরী স্বাস্থ্য সঙ্কটের জন্য অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থা রয়েছে, যা দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় আকারের। ৭১ হাজার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এই রিপোর্টিংয়ে যুক্ত। জাতীয় স্তর থেকে কাউন্টি স্তর পর্যন্ত ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক তৈরি রয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, মিসলস, মেনিনজাইটিসের ল্যাবরেটরি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মডেল পরীক্ষাগারের স্বীকৃতি পেয়েছে।

সাধারণভাবে যদি প্রশ্ন ওঠে চীনের স্বাস্থ্য মডেল কী, তাহলে কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়। এক, চীনে স্বাস্থ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, অগ্রাধিকার বলে চিহ্নিত। দুই, রোগ প্রতিরোধে ফোকাস। তিন, চিকিৎসা মূলত নন-প্রফিট, সরকারী হাসপাতালই চিকিৎসা কাঠামোর মূল ভিত্তি, সরকারী চিকিৎসা সর্বজনীন পরিষেবা। চার, গ্রাম-শহর বা বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এখনও যে পার্থক্য রয়েছে তা ক্রমশ কমিয়ে আনা, পরিকল্পনাও হচ্ছে সেই লক্ষ্যেই। পাঁচ, বেসরকারী সংস্থাকেও চিকিৎসায় ব্যবস্থায় অনুমতি দেওয়া কিন্তু বাজার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

করোনা ভাইরাস প্রথম দেখা যায় হুবেই প্রদেশের জমজমাট শহর উহানে। পরে বিশ্বজুড়ে তা ছড়িয়ে পড়লেও চীন সাফল্যের সঙ্গে এই মহামারীর মোকাবিলা করেছে। কীভাবে করেছে?

মাত্র দশ দিনে গড়ে উঠেছে করোনা চিকিৎসার এই হাসপাতাল

প্রথমত, তথ্য প্রচার। ঠিক যে জায়গাতে চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্রপতি -সহ কিছু মহল অভিযোগ আনছে। চীন সময়মত তথ্য প্রকাশ করেনি, ভাইরাসের চরিত্র জানায়নি বলে অভিযোগ আনা হচ্ছে। একেবারেই বাজে কথা। বস্তুত মহামারী মোকাবিলায় চীন প্রথম জোর দিয়েছিল স্বচ্ছ তথ্য সংগ্রহ ও জনগণকে জানানোর ওপরে। শুধু হুবেই প্রদেশে ২০০-র বেশি সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের সংক্রমণ, মৃত্যু, সুস্থ হয়ে ওঠার তথ্য দিয়েছে। কোথায় সংক্রমণ হচ্ছে, সংক্রমিতের স্পর্শে কতজন এসেছেন তার তথ্যও বিশদে দেওয়া হয়েছে। মহামারী মূলত নিয়ন্ত্রণে আসার পরে উহানে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয়েছে, তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই রোগের বৈশিষ্ট্য এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলের বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। জনগণকে অবহিত করা হয়েছে। কোন সুরক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া উচিত তা ধারাবাহিক ভাবে জানিয়ে যাওয়া হয়েছে। চাইনিজ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন একটি নির্দেশিকা জারি করে, তা জনগণের ব্যবহারবিধি হিসাবে পালিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনমত তৈরি করা হয়েছে। কোথায় কীভাবে রোগ মোকাবিলার চেষ্টা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রন্টলাইনে থেকে যাঁরা এ কাজ করছেন তাঁদের কথা বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থত, জনগণকে এই কাজে সামিল করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিক মহামারী প্রতিরোধক ব্যবস্থায় নেমেছেন, স্বেচ্ছাসেবীর কাজ

করেছেন। ওপর থেকে ফতোয়া জারি নয়, সামাজিক আন্দোলন হিসাবে চীনের জনগণ এই কাজে গ্রহণ করায় রোগ মোকাবিলা সহজতর হয়েছে।

পঞ্চমত, সংক্রমিত এলাকাগুলি ঘিরে ফেলার কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য উহান এবং হুবেই প্রদেশে জন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। গোটা দেশেই যান চলাচলের বিধিবিষেধ আরোপ করা হয়। উহানে ২৩ জানুয়ারি থেকে ৭৬ দিন লকডাউন থাকে। উহানে স্থায়ী বাসিন্দা ১কোটি ১০ লক্ষ। যে-সব এলাকায় তুলনায় চিকিৎসা ব্যবস্থা দুর্বল এবং বিশেষ করে গ্রামে যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় সেই লক্ষ্যে সেই জায়গাগুলিকে ঘিরে দেওয়া হয় অনেক আগেই। স্বেচ্ছা-পৃথকীকরণ বা আইসোলেশনের ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া হয়। জনজমায়েতের সব স্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফেস মাস্কের সর্বজনীন ব্যবহার শুরু করা হয়। ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরু হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ডিসট্যান্ট এডুকেশন চালু করা হয়। কমিউনিটি আইসেলোশন ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা। উহানে তা কঠোর ভাবে পালন করা হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে চিকিৎসা করা হয়েছে। এসবই এখন বিশ্বে স্বীকৃত ব্যবস্থা। মনে রাখা দরকার, এমন সময়ে চীন এইসব পদক্ষেপ নিয়েছে যখন বিশ্বের অন্যত্র তা চালু হয়নি। চীনই পথ দেখিয়েছে।

ষষ্ঠত, চীনের পদ্ধতি ছিল ‘দ্রুত চিহ্নিত কর, দ্রুত রিপোর্ট কর, দ্রুত পৃথক কর, দ্রুত চিকিৎসা কর’। আরেকটি পদ্ধতি হল ‘যাদের পরীক্ষা দরকার তেমন সকলকে পরীক্ষা কর, যাদের হাসপাতালে পাঠানো দরকার তাদের সবাইকে হাপাতালে ভর্তি কর, যাদের আইসোলেশন দরকার তাদের সকলকে তা কর’। দেশজুড়ে পরীক্ষা হয়েছে। এলাকা ধরে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। সমস্ত সংক্রমিতকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে। উপসর্গ আছে অথচ পরীক্ষায় সংক্রমণ ধরা পড়েনি, তাদের সকলকে পৃথক ভাবে রেখে নজরদারি ও চিকিৎসা করানো হয়েছে।

সপ্তমত, ভাইরাসের গতিবিধি নজর করার জন্য ১৮০০ এপিডেমিওলজিক্যাল গ্রুপ তৈরি করা হয়েছি, প্রত্যেক গ্রুপে পাঁচজন সদস্য। তাঁরা সংক্রমিত ও তাঁদের স্পর্শে আসা মানুষের উপসর্গ নজরে রেখেছেন। ফলে চিকিৎসা পদ্ধতিও এগিয়েছে দ্রুত। উপসর্গ আছে এবং নেই এমন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

অষ্টমত, চিকিৎসা করা হয়েছে সংক্রমণের উৎসকে ঠেকানো ও প্রসাররোধের লক্ষ্য নিয়ে। উহানো দশদিনের মধ্যে দুটি ১ হাজার শয্যার বিশেষ হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছিল। বেজিঙ সার্স হাসপাতালের ধাঁচে তা বানানো হয়। উহানে ১ লক্ষ নতুন শয্যা তৈরি করা হয়। ২০০নেগেটিভ প্রেসার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসা হয় গোটা দেশ থেকে। পরবর্তীকালে ৪২ হাজার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকেও সমবেত করা হয়েছিল উহানে। চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে মৃদু উপসর্গ থেকে সঙ্কটজনক এমন ছ'টি ভাগে ভাগ করে চিকিৎসা করা হয়। বিজ্ঞানী, গবেষক এবং চিকিৎসকদের সমন্বয় গড়ে তোলা হয়েছে যাতে অভিনব এই রোগের চিকিৎসা প্রতিদিন উন্নত হতে পারে।

নবমত, মহামারী মোকাবিলায় যে সম্পদ দরকার গোটা দেশে তা পরিকল্পিত ভাবে জড়ো করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক স্তরে সংগঠিত পদ্ধতিতে ঝড়ের গতিতে সেই সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। মেডিক্যাল সামগ্রীর উৎপাদনকেও বহুগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শেষত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল কম্যান্ড সিস্টেম। চীনে একেবারে শীর্ষ নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের শীর্ষ পদাধিকারীরা এই মহামারী মোকাবিলায় যুক্ত হয়েছেন। সেখান থেকে ধাপে ধাপে স্থানীয় প্রশাসন পর্যন্ত বিশেষ টিম কাজ করেছে। এখানে শিথিলতার কোনো সুযোগ ছিল না। সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধে চীনকে এগিয়ে রেখেছে।

ভিয়েতনাম

মহামারী মোকাবিলায় বিশ্বকে চমকে দিয়েছে ভিয়েতনাম। সব মিলিয়ে সংক্রমণ ৪০০-র মধ্যে সীমায়িত রেখেছে। মৃত্যু হয়নি। এই সাফল্যও হঠাৎ নয়।

ভিয়েতনামে নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২০(১) নম্বর ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, ২০(৩) নম্বর ধারায় চিকিৎসাশাস্ত্র, ওষুধ সংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মরণোত্তর দেহদানের বিষয়টিকেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৫৫-র

এটিএমে চাল: ভিয়েতনামের হ্যানয়ে।

ফেব্রুয়ারিতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মীদের সম্মেলনে হো চি মিন বলেছিলেন: থাকতে হবে সৎ এবং ঐক্যবদ্ধ। ভালোবাসতে হবে রোগীদের এবং উন্নত করতে হবে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে। হো চি মিনের পাঠানো ৩৬৮-শব্দের সেই চিঠি এখনও ভিয়েতনামের মূল মন্ত্র।

সাফল্যের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ। ১৯৮৫ পর্যন্ত ভিয়েতনামে স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলত পুরোপুরি বিনামূল্যে, সরকারি ভরতুকিতে। ১৯৮৬-তে দইমই সংস্কার চালু করে ভিয়েতনাম। তখন বেসরকারী ক্ষেত্রকেও অনুমতি দেওয়া হয়। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই এখনও আধিপত্য করছে।

এখন দেশের জনসংখ্যার ৮৭.৭ শতাংশই, দশ কোটির দেশে ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষই সরকারি স্বাস্থ্যবিমার আওতায়। গরিবদের জন্য এই বিমার প্রিমিয়ামের ১০০ শতাংশই দেয় সরকার। প্রায় গরিবদের ক্ষেত্রে এই হার ৭০ শতাংশ।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের যৌথভাবে প্রকাশিত গ্লোবাল মনিটারিং রিপোর্টের সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদন জানাচ্ছে: ৬-বছরের কম বয়সি শিশু আর গরিবদের চিকিৎসার জন্য কোনও পয়সাই লাগে না। দেশের ৯৭ শতাংশ শিশুই টিকাকরণের আওতায়। যেখানে মার্কিনমুলুকে এই হার ৯৫ শতাংশ। ১৯৯৫-২০১৫, গড় আয়ু ৭১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৬। পাঁচ-বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১ হাজারে ৫৮ থেকে কমে হয়েছে ১৮। একই সময়ে প্রসূতিকালীন মৃত্যুর হার কমেছে ৭৫ শতাংশ। ২০০০-১৮, এই সময়ে পাঁচবছরের কম বয়েসিদের অপুষ্টির হার ৩০.১ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৩ শতাংশ।

২০১৭-তে, জনস্বাস্থ্যে ভিয়েতনাম খরচ করেছে জিডিপি'র সাড়ে ৭ শতাংশ। ১৬১০ কোটি ডলার। এবছর তা ২০০০ কোটি ডলারে পৌঁছনোর কথা। ২০১২ থেকে স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি খরচকে ছাপিয়ে গিয়েছে সরকারি খরচ। এর মূল কারণ স্বাস্থ্যবিমায় জোর।

ভিয়েতনামে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচ ১৪২ ডলার। এতে সরকারের খরচের সঙ্গেই আছে মানুষের পকেট থেকে দেওয়া অর্থ। ২০১৪'র হিসেব অনুযায়ী, তাতে সরকারি খরচের হার ৫৪ শতাংশ, বাকি ৪৬ শতাংশ মানুষের পকেট থেকে।

ভিয়েতনামে হাসপাতালের সংখ্যা ১৩৪৬। এর মধ্যে সরকারি ১১৬১। বেসরকারি ১৮৫। আছে জেলা-স্তরে ৭০০টির বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ১১,০০০ কমিউন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক। এইসব কেন্দ্রে থাকেন ডাক্তার, নার্স, প্রশিক্ষিত ধাত্রী। এবছরের মধ্যে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশকেই স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা সরকারের লক্ষ্য।

নিজেরা তো মহামারীকে পরাস্তই করেছে, সেইসঙ্গে একদিন যারা ইতিহাসের বর্বরতম সামরিক আগ্রাসনের অন্যতম চাপিয়ে দিয়েছিল, যে আগ্রাসনে ব্যবহৃত রাসায়নিক অস্ত্রের প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাড়ে ৪ লক্ষ মাস্ক, সুরক্ষা পোশাক পাঠিয়েছে ভিয়েতনাম। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়। এমনকি ফ্রান্সকেও।

৫,৫০,০০০ ব্যাক্টেরিয়া-প্রতিরোধক মাস্ক তুলে দিয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন এবং ব্রিটেনকে। উপহার হিসেবে। মেডিক্যাল সামগ্রী পাঠিয়েছে লাওস ও কাম্বোডিয়াকে। ফেব্রুয়ারিতে, ভিয়েতনাম ৫ লক্ষ ডলার মূল্যের চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে চীনে।

এবং কিউবা

করোনায় আক্রান্ত হয়েও তা সামলে নিয়েছে কিউবা। শুধু সামলেই নেয়নি দুনিয়াকে দেখিয়েছে সাহস কাকে বলে, মানবিকতারই বা অর্থ কী। সমুদ্রে আটকে থাকা ব্রিটিশ জাহাজে সংক্রমণ, কেউ বন্দরে ভিড়তে দিচ্ছে না, কিউবা সেই জাহাজকে হাভানার বন্দরে আসতে বলেছে। সংক্রমিতদের নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করেছে। এক কথায় সংক্রমণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কিন্তু মানবতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যথারীতি করোনা মোকাবিলায়
 কিউবার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের দল ছুটেছে বিশ্বের নানা

প্রান্তে। ইতালির লোম্বর্ডিতে, স্পেনের বার্সেলোনায়। ৩৭টি দেশে গেছে কিউবার স্বাস্থ্য-দল।

একদিনে হয়নি। ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবের পরপরই স্বাস্থ্যের অধিকারকে সর্বজনীন অধিকার ঘোষণা করে বিনামুল্যে সকলের জন্য চিকিৎসার কাঠানো তৈরি করে ফেলে। ফিদেল কাস্ত্রো-চে গুয়েভারারা প্রথম থেকেই চিকিৎসা কাঠামোকে উন্নত করার ওপরে জোর দিয়েছিলেন, ফলাফল হল কিউবায় মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক। এর ফল শুধু কিউবাই পায়নি, ছ'দশকে ৪ লক্ষ কিউবান ডাক্তার পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে চিকিৎসা করেছেন। কিউবায় জোর দেওয়া হয় রোগ প্রতিরোধে। ১১টি ভ্যাকসিন পায় শিশুরা, মোট ১৩ টি রোগ ঠেকাতে। শিশু বয়স থেকেই ধারাবাহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে থাকে মানুষ। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে রোগ হলে চিকিৎসা হবেই।

মার্কিন অবরোধের মধ্যে কাটাতে হয়েছে কিউবাকে। ওষুধ আনা যায়নি। আজ সেই অবরোধ ভেঙেই প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধ নিজেরাই তৈরি করছে কিউবা

চীনের যেমন বেয়ারফুট ডাক্তার ছিল কিউবার ফ্যামিলি ডক্টরস। তাঁরা এখনও রয়ে গেছেন। এই নেটওয়ার্কে দেশের প্রায় সব নাগরিকই রয়েছেন, পরিবার ধরে এই চিকিৎসকরা খোঁজ রাখেন। মহামারীর মত ঘটনায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। কিউবায় করোনা মোকাবিলার প্রাথমিক কাজই হয়েছে বাড়িতে। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গেছেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন। কেউই পরীক্ষার বাইরে থাকেননি। প্রায় ৪০ হাজার নাগরিককে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই।

কিউবার মেডিক্যাল ব্যবস্থার উন্নতির পিছনে জৈবপ্রযুক্তির উন্নয়ন অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। ১৯৮১-তে তৈরি হয় বায়োলজিক্যাল ফ্রন্ট– চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক শাখাকে নিয়ে বায়ো টেকনোলজি উন্নয়নের প্রচেষ্টা। তা ফল দিয়েছে। অনেক ভাইরাসের প্রতিষেধক এখন কিউবাতেই পাওয়া যায়। এমনকি কোনো কোনো ভবাইরাসের

প্রতিষেধক কিউবাতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে। মেনিনজাইটিস বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি-র ভ্যাকসিন এর মধ্যে রয়েছে। এইডসের ক্ষেত্রে মা থেকে শিশুর সংক্রমণ প্রথম আটকে দেয় কিউবাই।

পুঁজির দখলদারিতে থাকা এই ক্ষেত্রে কিউবা সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে। মার্কিন অবরোধের মধ্যে কাটাতে হয়েছে কিউবাকে। ওষুধ আনা যায়নি। আজ সেই অবরোধ ভেঙেই প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধ নিজেরাই তৈরি করছে কিউবা। এক মার্কিন বিশেষজ্ঞের কথায়, প্রথমে কিউবা প্রয়োজন চিহ্নিত করে, তারপরে বিজ্ঞানীদের সেখানে মাথা খাটাতে বলে, তারপরে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে, তারপরে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করে, তারপর ওষুধ বাজারে নিয়ে আসে। এবং, এমন ভাবে সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয় যা অভিনব। ‘পয়সা নেই, বিশদ পরিকল্পনা রয়েছে’, এই হচ্ছে কিউবা সম্পর্কে মূল্যায়ন। কিউবায় প্রায় ২০০ আবিষ্কার থেকে ওষুধ তৈরি হয়েছে, তা ৪৯টি দেশে বিক্রিও হয়। পার্থক্য এই যে মুনাফার সন্ধানে এই প্রক্রিয়া নয়। বিশ্ব মহামারীর সময়ে প্রমাণিত হচ্ছে কীভাবে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী।

একটি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সংগ্রাম

নীলোৎপল বসু

শুরুতেই একটা বিধিবদ্ধ বক্তব্য নথিবদ্ধ করা যাক। কেরালা নিঃসন্দেহে একটা উজ্জ্বল জায়গা হয়ে উঠেছে,বিশ্ব মহামারীর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভবত একমাত্র প্রধান রাজ্য। কিন্তু তবু, কেরালা এবং তার জনগন যখন বড় সাফল্য অর্জন করেছে, অবশ্যই বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে, তখনও কিন্তু লড়াই জারি আছে। সাথে তৃতীয় একটি প্রবাহেরও মুখোমুখি হতে হচ্ছে, প্রবাস থেকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মানুষজন এই রাজ্যে ফিরছেন। এ’অবস্থায় নজরদারির সার্বিক পরিকল্পনা খুব ভালভাবেই জারি রয়েছে।

তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই সামনে যে দিনগুলো আসছে তার জন্য এর তাৎপর্য এবং শিক্ষা দ্রুত উপলব্ধি এবং আত্মস্থ করা প্রয়োজন। কেরালায় যে ৩০শে জানুয়ারি প্রথম কোভিড আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিলো, তা সবাই জানেন। এটাও সবাই জানেন যে, এক পক্ষকালের মধ্যে কেরালায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ'সবই এখন ইতিহাস।

শুধু দেশের মধ্যেই নয়, এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেরালার রেকর্ড গোটা বিশ্বের কাছেও স্বীকৃত। যারা এই মহামারি নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দেশের মধ্যে কেরালা দু'দিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছে। এল ডি এফ সরকার অবিচলভাবে তার কর্তব্য পালন করে চলায় কেন্দ্রের মনোনীত কেরালার রাজ্যপাল প্রবলভাবেই তার প্রশংসায় সোচ্চার হয়েছেন।ভাইরাসের সংক্রমন রুখে ভাইরাসের বিপদ মোকাবিলার জন্য আগ্রাসী পরীক্ষা ব্যবস্থা, কোয়ারেন্টাইন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানোর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের পুরো জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করেছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর)-য়ের মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যা বিভাগের প্রধান ডাঃ গগনখেদকার-ও কেরালায় ঘুরে দেখার পর তা নিয়ে প্রশংসা করেছেন।

ভাইরাসের বিপদকে পরাস্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত দিকটা ছাড়াও এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য যেভাবে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের জীবনের সুরক্ষার বিষয়গুলোতে নজর দিয়েছে সেই দিকটাও ব্যাপকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রশংসা কুড়িয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা এবং পায়ে হেঁটে শত শত কিলোমিটার, কখনো হাজার কিলোমিটারেরও বেশি লং মার্চের কথা টেলিভিশনের মাধ্যমে যখন ভারতের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে তখন মৌলিকভাবে কেরালার ভিন্ন ভূমিকা মানুষের ব্যপক অংশকে অনুপ্রানিত করেছে। তাঁদেরকে 'অতিথি শ্রমিক' অ্যাখ্যা দিয়ে এবং লকডাউনের পরিস্থিতিতে তাঁদের মধ্যে বয়স্কদেরও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বীমার আওতায় এনে কেরালা আজ মডেল হয়ে উঠেছে। যদিও আফসোসের বিষয় হলো, বেশিরভাগ রাজ্যই এই বিষয়গুলিকে অনুসরণ করেনি। এটা যে সহানুভূতি দেখানোর কোনো বিষয় নয়, বরঞ্চ ভাইরাসের মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এটা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা কেরালা বুঝিয়ে দিয়েছে।

এর শুরুটা কখন হয়েছিলো?

এল ডি এফ সরকারের নেতৃত্বে কেরালা কিভাবে তার সমস্ত মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে ফেললো, সেখানে সি পি আই (এম) এবং বিভিন্ন শ্রেণি সংগঠন ও গণসংগঠন, গণ আন্দোলন, নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় সংস্থা, সবাই মিলে কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলো, তা মার্কসবাদী পথের পাঠকদের বোঝা জরুরি। বামপন্থীদের ব্যপক ভূমিকা, যা কিনা সরকার পরিচালনার জন্য মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে, সেটাও বোঝা প্রয়োজন। সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পরিচালনা করার জন্য এই দায়িত্বিবান রাজনৈতিক আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি যথার্থ জনস্বাস্থ্য নীতির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গণতান্ত্রিক সমাজের আবশ্যিক কর্তব্য। যদিও আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির পরিচালনাধীন বিশ্বায়নের আক্রমণ এবং তার হাত ধরে চলা নয়া উদারবাদী আগ্রাসন সমালোচনার উর্ধে থাকা এই নীতির উপরেও আঘাত নামিয়ে এনেছে।

মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সাথে বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য হলো জরুরি পূর্বশর্ত। নয়া উদারবাদী আগ্রাসন এই পাঁচটি জরুরী বিষয়ের সাথে পণ্য এবং পরিষেবাকেও পুঁজির আওতায় নিয়ে এসেছে। এর অনুসারী হিসাবে ফাটকা লাভের ব্যবস্থারও শিকার আজকের ভারত। যা জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একটি যথার্থ জনস্বাস্থ্য নীতির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গণতান্ত্রিক সমাজের আবশ্যিক কর্তব্য

কেরালা এই ধারার মাথা নুইয়ে দিতে পেরেছে। কমরেড ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা যার সূচনা করেছিলো তাকেই উর্ধে তুলে ধরেছে। শাসন ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক বদল ঘটলেও ১৯৫৭ সালের সেই

সরকারের সময় থেকেই মানুষের স্বাস্থ্য এবং শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য নীতি কেরালার প্রধান অবলম্বন হয়ে রয়েছে। ই এম এস সরকার যার সূচনা করেছিলো তার সহজাত শক্তির শিকড় শক্তপোক্তই রয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও সেখানে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের দায়বদ্ধতা এবং তৃণমূল স্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ধারাবাহিক জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী ভাবেই রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সাথে সেখানকার অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিপুল বিস্তার এবং কেরালার সমাজের মানুষ ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতার মেজাজ। কেরালার মানুষ বড় বড় যে বিপদগুলোর মোকাবিলা করেছেন, তার মধ্যে দিয়েই বারেবারে এই বাস্তবতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে,২০১৮ সালের মে মাসে নিপা ভাইরাসের আক্রমণ এবং ২০১৮ সালের বিধ্বংসী বন্যা মোকাবিলা করার সময়েও এই বিষয়গুলো সামনে এসেছে।

নিপাও অপ্রত্যাশিতভাবে কেরালায় আঘাত হেনেছিলো। যা ছিলো অজানা এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটি ভাইরাস এবং কোভিডের থেকে ভিন্নতর। কিন্তু অত্যন্ত কম সময়ে এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রনের জন্য কেরালা জনস্বাস্থ্যের সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়েছিলো এবং মানুষের জীবনহানিকে ন্যূনতম জায়গায় রাখতে পেরেছিলো। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কেরালার দুরন্ত প্রচেষ্টা এই ভাইরাসকে রাজ্যের সীমানার বাইরে ছড়াতে দেয়নি। কিন্তু এর থেকে সেই রাজ্যের মানুষ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। সংক্রমিত মানুষের পরীক্ষা, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং কোয়ারেন্টাইনের ক্ষেত্রে কেরালা একটি দুর্দান্ত নজরদারি বিধি-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো। আক্রান্তদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো এবং চিকিৎসা করা হয়েছিলো। এই লড়াইয়ে স্বাস্থ্য কর্মী যোদ্ধারা সাহসের সাথে লড়াই করেছিলেন, এমন কি কয়েকজন জীবনও দিয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ যেটা হয়েছিলো তা হলো, যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামনের সারিতে থেকে লড়াই করছিলেন, তাঁরা এ'ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছিলেন। উলটো দিকে, জনস্বাস্থ্যের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস

পর্যাপ্ত টেস্টিং-এর ফসল : ব্রেক দ্য চেন

গড়ে উঠেছিলো। এই বিশ্বাসটাই কোভিড চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে এল ডি এফ সরকারের পর্যাপ্ত বিনিয়োগই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একটি বিশ্বব্যাপী মহামারীর মোকাবিলা যখন করতে হয়, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো এবং তাকে সাহায্য করার বাইরেও কিছু প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একটি দৃষ্টিভঙ্গির। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে,চীনের উহানে যখন একটা অজানা ভাইরাসের কথা প্রথমে জানা গেলো এবং ৫ই জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) নোভেল ভাইরাস সংক্রমণকে বিস্তারিত ব্যখ্যা সহ জরুরি জনস্বাস্থ্যের বিষয় বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলো, আর ১১ই জানুয়ারি তার জিনগত বৈশিষ্ট্যের (জিনোম) পরম্পরার কথা প্রকাশ করলো, তখনই এর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সজাগ হয়ে গিয়েছিলেন। এরফলে, উহান থেকে প্রথম ছাত্রটি ৩০শে জানুয়ারি রাজ্যে ফেরার আগেই, ২৭শে জানুয়ারি কেরালায় একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ বৈঠক হয়।পরীক্ষায় ওই ছাত্রটির কোভিড ধরা পড়ে। দেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্বতঃপ্রণোদিত সক্রিয়তাটাই অনুপস্থিত।

স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের কিছু অগ্রাধিকার ছিলো। ২৩শে-২৪শে ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে প্রচুর হাঁকডাক করে ‘নমস্তে ট্রাম্প’ অনুষ্ঠান, ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লিতে তীব্র সাম্প্রদায়িক হিংসা, যা ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জারি ছিলো এবং মার্চের মাঝামাঝি মধ্যপ্রদেশের কমলনাথ সরকারকে ফেলে দেওয়া, এসবই সর্বোচ্চ

রাজনৈতিক দায়িত্বের সব মনোযোগ দখল করে রেখেছিলো। একের পর এক এইসব কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে এই মহামারী, তার বিস্তার, তাকে মোকাবিলার প্রস্তুতি, সবকিছুই বেলাইন হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, ১৩ই মার্চ, এতদিন পরেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জনসমক্ষে টুইট করে বললো, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরি কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

এটা বুঝতে কোনো সমস্যাই হয় না যে, বিদেশ থেকে যেসব যাত্রী ফিরছেন, একদম প্রথম থেকেই তাঁদের স্ক্রিনিং করা উচিত ছিলো। সেটাও শুরু হয়েছিলো মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে, তাও শুধুমাত্র বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রে। খুবই দুর্বল একটা জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যের জন্য মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি-র) ১ শতাংশেরও কম বাজেট প্রতিশ্রুতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান বেসরকারীকরণ, সাথে সরকারের ভালোরকম পৃষ্ঠপোষকতা ও মদতে বেসরকারী বীমা কোম্পানিগুলোর বাড়বাড়ন্ত ভূমিকা, এসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশটাই ভাইরাসের এই মহামারীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়লো।

তবে জনস্বাস্থ্য, ভাইরাসবিদ্যা এবং মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যার সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা রয়েছেন তাঁরা এই রোগের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে লড়াইয়ে নেই, এমন কথা কিন্তু বলা যাবে না। ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের দেশে দুটো বড় ধরনের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, যেখানে কিভাবে কোভিড বিপদ মোকাবিলার বিষয়টি সূত্রাবদ্ধ করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা ছিলো। কিন্তু হায়! এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কয়েকজন লেখক, যাঁদের কয়েকজন আবার টাস্ক ফোর্সেরও অংশ, হতাশার সাথে দেখেছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবগুলো নিয়ে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা আগে থেকেই সতর্ক করে বলেছিলেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসস্থানগুলোতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় এবং তাঁরা সবাই মিলে একই শৌচাগার ব্যবহার করায় তাঁদের মাধ্যমে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার প্রবনতা থাকবে।

কেরালার প্রচেষ্টাকে বুঝতে গেলে দেখা যাবে দেশের সরকারের প্রতিক্রিয়ার সাথে তার স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। যার থেকে বোঝা যাবে, উদ্যোগ ছাড়া এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এখনো পর্যন্ত জাতপাত, শ্রেণি, ধর্ম অথবা এই ধরনের কোনো পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই ভাইরাস গণতান্ত্রিক ও বাছবিচারহীন হতে

পারে, কিন্তু দুর্বল এবং গরিব অংশের মানুষের উপরেই যে এই রোগের আক্রমণ অনুপাতহীনভাবে বেশি, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নয়া-উদারবাদের উত্তরাধিকার চিকিৎসা পরিষেবায় সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রেরাশি রাশি বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে, যা রোগভোগের দিক থেকে এই বিপদকে আরো ধ্বংসাত্মক করে তুলেছে। আর এ'কারনেই আমরা এমন চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিপুল অংশে, যারা অর্থনীতির দিক থেকে শক্তিশালী বলে পরিচিত,সেখানে এই বিষয়টা খুব বেশি প্রকট। আর কেরালা সমতা বজায় রাখা, বাছবিচার না করা আর সবাইকে সাথে নিয়ে চলার উপর জোর দিয়েছে এবং মহামারী মোকাবিলার জন্য যে কোনো সময়ে অনেক বেশি প্রস্তুত থেকেছে।

কেরালা আসলে কি করেছে?

কেরালার যেভাবে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য,আগ্রাসী পরীক্ষা ব্যবস্থা, আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো নজরে রাখা (ট্রাকিং), খুঁজে বার করা (ট্রেসিং) এবং কোয়ারেন্টাইনে রাখা। এটা আশ্চর্যের যে, আই সি এম আর-য়ের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের সুপারিশে এবং ভারত সরকারও তাদের নথিতে এই বিষয়গুলোর উপরেই জোর দিয়েছিলো। এই রোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কেরালার পরীক্ষার হার দেশের বাকি রাজ্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিলো। অন্যদিকে, কেরালার পরীক্ষার হার দেশের বাকি রাজ্যগুলোর তুলনায় বেশি থাকলেও আমাদের দেশের পরীক্ষার হার বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম ছিলো। কিন্তু কেরালার ভূমিকা যেখানে সত্যিই ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে তা হলো নজরে রাখা (ট্রাকিং), খুঁজে বার করা (ট্রেসিং)-র একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা,যা বর্তমানে ভাইরাস ছড়ানোর জীবন্ত মানচিত্র হিসাবে পরিচিত। সম্প্রদায় এবং প্রতিবেশি কমিটিগুলোর বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা এবং বিকেন্দ্রীকৃত পরিকাঠামোর মাধ্যমে এমনটা সম্ভব হয়েছিলো। যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা গিয়েছিলো, যা সংক্রমণ ছড়ানোর গতিকে কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে সাহায্য করেছিলো। এর সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলো সচেতনতা গড়ে তোলার ব্যপক প্রচার এবং হাত ধোয়া ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপর জোর দিয়ে 'শৃঙ্খল ভাঙো' (ব্রেক দ্য চেন)-র কার্যকরী

স্লোগান। মানুষের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য মৃত্যুহার যাতে কম থাকে তার জন্য সচেতনতা প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো।

কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নতুন নতুন বিষয় প্রবর্তন করা এবং সংস্কারের ওপর বারে বারে জোর দিতে থাকলেন, শুরু হলো বড় ধরনের উদ্যোগ। যার ফলস্বরূপ পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির সহযোগিতায় কেরালা ভাইরাসবিদ্যার প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। কোভিড পর্বে কাসারগোদে গড়ে উঠলো বিশেষ কোভিড হাসপাতাল। সংক্রমিতদের অবস্থা বোঝার জন্য দ্রুত ফল পেতে সমস্ত রকম পরীক্ষা চালু করা হলো। পর পর (র‍্যাপীড) পরীক্ষা, অ্যান্টিবডি পরীক্ষা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো কিয়স্কের মাধ্যমে পরীক্ষার উপাদান সংগ্রহ। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, আই সি এম আর-য়ের অনুমোদন নিয়ে কেরালা প্লাজমা চিকিৎসা শুরু করে দিলো। যেখানে সেরে ওঠা রোগীদের শরীরে ভাইরাসের মুক্তির সময়ে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাকেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য কেরালায় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়, যার ফলে তাঁদের একজনেরও জীবন যায়নি।

লাগাতার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করার এই আকাঙ্খাই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানোর স্থূল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছে

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এবং ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রধান বিরোধী দলের সাথে প্রাথমিক ধ্যানধারণাগত ফারাক সত্ত্বেও বিরোধীদের সবার সাথে অকপট মতবিনিময় করা হয়েছে। বিষয়টাকে লঘু করে দেখানোর যে পদ্ধতির পক্ষে ইউরোপ এবং আমেরিকা ব্যাপকভাবে সওয়াল

করেছে তার বিপরীতে গিয়ে কেরালার সরকার সামাজিক হস্তক্ষেপ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি অতিসক্রিয় এবং আগ্রাসী ভূমিকা পালন করেছে।

লাগাতার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করার এই আকাঙ্খাই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানোর স্থূল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছে। তবলিগি জামাতের নিজামুদ্দিন মার্কেজ সংক্রান্ত ঘটনার পরেই এই লড়াইয়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটা সামনে আসে। দিল্লির এই ধর্মীয়সভা ছিলো ধর্মীয় মতাবলম্বীদের একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ, যেখানে বিদেশ থেকে আসা তবলিগিরাও অংশ নিয়েছিলেন। শুধু ভারতেই নয়, সব জায়গাতেই বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের ধর্মীয় সভাগুলো রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে বলেই প্রমানিত হয়েছে। এই বিষয়টা বিবেচনা করলে সরকার তার দায় এড়াতে পারে না। যেমন মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বাইয়ে একই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো। যদিও, এই বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের না বিমান বন্দরে স্ক্রিনিং করা হয়েছিলো, না সরকার সতর্ক ভাবে কোনো নজর রেখেছিলো।

যদিও, যখন পরীক্ষার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের কোভিড সংক্রমণ রয়েছে বলে জানা গেলো তখন সব কিছু রসাতলে গেছে বলে হইচই শুরু হলো। শুধু তবলিগিদের বিরুদ্ধে নয়, গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই বিজেপি এবং তার সোশ্যাল মিডিয়া ব্রিগেড উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে তারা বন্যার মতো মিথ্যা খবর এবং জাল ভিডিও ছড়াতে থাকলো। আরো দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতোই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র ভাইরাস ছড়ানোর জন্য তবলিগিদের নাম নিয়ে বসলেন। এটা এতই গুরুতর যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র এই ধরনের পরিচয় ভিত্তিক চিহ্নিতকরণের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এধরনের ঘটনা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে দেবে। বাস্তবিকভাবেই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ এবং ইসলাম আতঙ্কে (ইসলামফোবিয়া) ভোগা প্রজন্ম বিশ্ব জুড়েই কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়সড় প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করে দিচ্ছে,বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে,যেখানে প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় রয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে কেরালা যা করলো সেটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। রাজ্য থেকে নিজামুদ্দিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন এমন ৬০জনের বেশি মানুষকে কেরালা চিহ্নিত করলো, তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হলো এবং তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরাএসেছিলেন তাঁদেরকেও খুঁজে বার করা হলো। এই উদ্যাগের ফলে কোনো মৃত্যুর ঘটনাই ঘটলো না। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে 'ব্রেক দ্য চেন'-য়ের জন্য এল ডি এফ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে ধর্মীয় নেতাদের কাছে বড় ধর্মীয় সভা না করার অনুরোধ করলেন এবং বাড়িতেই প্রার্থনা করার উপদেশ জারি করতে বললেন। যাতে ব্যপক সাড়া পাওয়া গেলো, যা কিনা সংক্রমণের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিশ্বাসকেই বাড়িয়ে তুললো।

স্বচ্ছতার প্রশ্নে দৃঢ় সংকল্প প্রতিশ্রুতি, যা ৩০শে জানুয়ারি থেকে প্রায় প্রতিদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিলো, যিনি সংবাদ মাধ্যমের সাথে খোলামেলা মত বিনিময় করতেন এবং সরকারের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য তাদেরকে বিস্তারিত ভাবে জানাতেন। আর তা আত্মসর্বস্ব অবৈজ্ঞানিক হাবিজাবি তথ্য নয়, সেগুলো ছিলো বিশেষজ্ঞ কমিটির যৌথ পর্যবেক্ষনের থেকে পাওয়া তথ্য, যে বিশেষজ্ঞ কমিটি চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক পেশার সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের সাথে সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তৈরি।

একই সঙ্গে এইসব উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কমরেড পিনারাই বিজয়ন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। যিনি এই ভাইরাসের চরিত্র এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে গোটা সমাজ কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। যা মানুষকে উদ্দীপ্ত করতো। এই প্রচেষ্টাকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্যকরীভাবে উপস্থাপনা করতেন। তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতেন, তিনি কোনো 'হাবিজাবি আগডুম-বাগডুম-য়ে বিশ্বাস করেন না। তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্ট যে কথা উঠে আসতো তা হলো, 'কোভিডের মতো একটা মহামারী মোকাবিলার জন্য বৈজ্ঞানিক মেজাজ, মানবিকতা এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের উদ্যম থাকা জরুরি। গোবর এবং গোমূত্রের যাঁরা প্রশংসা করেন তাঁদের বদলে বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের আমি দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করি।'

বিজ্ঞান ভিত্তিক হস্তক্ষেপ ছাড়াও আর যে বিষয়টার জন্য কেরালা উঠে দাঁড়াতে পেরেছে তা হলো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার সার্বিক ও সুসংহত উদ্যোগ। মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার

'অতিথি শ্রমিকদের' জন্য মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান

সময় এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যৌথ ভিত্তিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে হয় না। সরকারী প্রশাসনের লকডাউনের পরিস্থিতিতে খাদ্য এবং জীবনজীবিকার বিষয়গুলো যদি একইসাথে মেটানো যায় একমাত্র তবেই তা সম্ভব হয়। কেরালা সরকারী হস্তক্ষেপে যেমন স্কুল বন্ধ করেছিলো, জমায়েতগুলো বন্ধ করেছিলো তেমনই তার সাথেই শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিড ডে মিল পৌঁছে দিয়েছিলো। অতিথি শ্রমিকদের জন্য ব্যপক সংখায় শিবির বানিয়েছিলো এবং রান্না করা ও রেশনের হিসাবে দু'ই ভাবেই তাঁদের কাছে খাদ্যপৌঁছে দিয়েছিলো। পৌঁছে দিয়েছিলো অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। সবটাই হয়েছিলো প্রশাসন এবং সামাজিক স্তরের প্রতিবেশি কমিটিগুলোর কড়া নজরদারিতে, যার মধ্যে দিয়েই শৃঙ্খল ভাঙা (ব্রেক দ্য চেন) সম্ভব হয়েছিলো।

পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে হলফনামা জমা দিয়েছিলো তাতে কেরালার অসাধারণ ভূমিকার কথা স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো। সেখানে বলা ছিলো, সরকারি সংস্থাগুলো সারা দেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে তার ৬৮শতাংশ কেরালা সরকারের তৈরি এবং সারা দেশে সবমিলিয়ে যতজন পরিযায়ী শ্রমিক এধরনের শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন সংখ্যার বিচারে তার ৫০শতাংশ শ্রমিকই কেরালার শিবিরগুলিতে রয়েছেন। কমিউনিটি কিচেন এবং জনতা কিচেন গড়ে রান্না করা খাবার দেওয়ার জন্য মহিলা পরিচালিত কুদুম্বশ্রী গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছিলো। রাজ্য সরকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলো সেই অনুসারে মানুষের হাতে টাকা, পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবেও এই

গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হতো। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম লকডাউন ঘোষণার আগেই এসব কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিলো।

রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্যাকেজের বৈশিষ্ট:

১) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রাজ্যের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ। কেউ যাতে বাদ না যান, সবাই কে অন্তর্ভুক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই প্যাকেজ।

২) অগ্রিম দুই মাসের কল্যানমুখী (ওয়েলফেয়ার) পেনশন।

৩) যে পরিবারগুলো ওয়েলফেয়ার পেনশন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না তাদের পরিবার পিছু ১০০০টাকা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ১৩২০কোটি টাকা।

৪) যে পরিবারগুলির প্রয়োজন তাদের সবাইকে বিনামূল্যে খাদ্য শস্য দিতে ১০০কোটি টাকা।

৫) ভরতুকি দিয়ে ২০টাকায় খাবার দেওয়ার জন্য ৫০কোটি টাকা।

৬) স্বাস্থ্য প্রকল্পে ৫০০কোটি টাকা।

৭) কুদুম্বশ্রী গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার জন্য ২০০০কোটি টাকা।

৮) কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার প্রকল্পে ২০০০কোটি টাকা।

৯) এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ১৪হাজার কোটি টাকা।

১০) অটো, ট্যাক্সির ফিটনেস চার্জে ছাড়।

১১) গণ পরিবহনে কর ছাড়।

১২) বিদ্যুৎ এবং জলের বিল জমা দেওয়ার তারিখের ক্ষেত্রে ছাড়।

১৩) সিনেমা হলের বিনোদন কর কমানো।

রাজ্যের আর্থিক ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বোঝা, অন্যভাবে বললে, গুরুতর অবস্থা। দেশে যে মন্দা চলছে, বেকারি বাড়ছে, দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যা এল ডি এফ সরকারের উপরেও আঘাত নামিয়ে এনেছে, তার প্রেক্ষাপটে সরকার এটা বুঝতে পেরেছিলো যে, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে মানুষকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় নিরাপত্তার আশ্বাস না দিতে পারলে এই লড়াই কিছুতেই জেতা যাবে না। বিশেষ করে মানুষের স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রশ্নে কেরালা সহ সমস্ত রাজ্যের ওপরে যখন বড়সড় আর্থিক বোঝা নেমে এলো তখন কেন্দ্রীয় সরকার কোনো আর্থিক

সাহায্যই করলো না। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে জি এস টি বাবদ রাজ্যগুলোর যে ন্যায্য পাওনা বকেয়া, তাও মেটালো না কেন্দ্র। ঐক্যের জন্য এবং মানুষকে সংগঠিত করার জন্য যা করা দরকার, তাও করলো না। কেন্দ্রের গালগল্পের আর্থিক প্যাকেজের বিপরীতে কেরালার এই প্যাকেজের বৈশিষ্টগুলি স্পষ্ট দেখিয়ে দিলো যে, সেখানে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়ার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই

শেষ পর্যন্ত এটা একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি। সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের তাদের নিন্দুকরা এটা বলে সমালোচনা করে থাকে যে, তাঁদের বিশ্লেষণ এবং সুপারিশগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় না। আকারে ইঙ্গিতে সবসময় এটা বোঝানোর চেষ্টা হয় যে, অলঙ্কার সর্বস্য তাত্ত্বিক জগতের ভাষার ওপর জোর দেওয়ার দিকেই আমাদের ঝোঁক।

যদিও কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই এই সমালোচনাকে ভালো ভাবেই প্রতিহত করেছে। শুধু দেশে নয়, বিশ্ব জুড়ে বড় বড় সংবাদমাধ্যমগুলোর কেউ কেউ-ও যে এই মহামারীর বিরুদ্ধে কেরালার লড়াইকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছে। আর একথা কেউ অস্বীকারও করতে পারবে না। ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস ও আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ব্রিটেনের বি বি সি, গার্ডিয়ান থেকে গাল্ফ টাইমস, স্ট্রেইট টাইমস সহ মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত সংবাদমাধ্যম, ফ্রান্সের লা মনডে এবং ইতালির লে স্টেম্পা থেকে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংবাদমাধ্যম সবাই উচ্চকণ্ঠে কেরালার ভূমিকাকে সমর্থন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, 'মানুষের আগে মুনাফা', নয়া উদারবাদের এই মতবাদকে কেরালা 'মুনাফার উর্ধে মানুষ' এই মতবাদের মাধ্যমে মোকাবিলা করেছে। চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে যা একটা দৃষ্টান্ত। তাই, কেরালার লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যের এই উপাদানের জন্য কেরালার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বামপন্থী নেতৃত্বকে সম্মান জানাতেই হবে। স্প্যানিস ফ্লুর উদাহরণ টেনে গার্ডিয়ান পত্রিকার কলম লেখক বলেছেন, ১৯১৮ সালে স্প্যানিস ফ্লু বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিলো, প্যারিসে ধনী মানুষের এলাকাতেই মৃত্যুর হার ছিলো সব চেয়ে

বেশি। এই বিষয়টা বৈজ্ঞানিকদের ততক্ষণ হতবাক করে রেখেছিলো

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, এরা সেই সম্পদশালী মানুষজন নন যাঁদের চোখ রক্ত বর্ণ, যাঁদের চামড়ায় কলঙ্ক লেগে, যাদের ঘরে শস্য স্তুপীকৃত। এরা আসলে হলো তাঁদের ভৃত্যের দল।'

তিনি শেষ করেছিলেন এভাবে, 'যখন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী সমাজ তাদের জনগনকে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু করছে না, তখন ভারতের একটা রাজ্য কেরালা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, মহামারী আক্রান্ত ইংল্যান্ডের সমস্যা তার আর্থিক ঘাটতি নয়, এমনকি জ্ঞানের অনুপস্থিতিও নয়। এটা হলো সরকারের শীর্ষ মহলের অবহেলা, যার ফলে তারা আমাদের সমাজকে যৌথভাবে দেখেনি, যেখানে কিনা প্রত্যেকেরই গুরুত্ব রয়েছে, উলটে তারা বলেছে, পশুর দল।'

তাই, চূড়ান্ত প্রশ্নটা একেবারেই সুনির্দিষ্ট ভাইরাসবিদ্যা কিংবা মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যা নিয়ে নয়, যেভাবে কিনা বর্তমান মহামারীকে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। তার বদলে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা গণতন্ত্রই একজন সুস্থ সতেজ লোকের চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত, যা মহামারীর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারে।

এ'নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, এই অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের শাসক গোষ্ঠী চোখে ঠুলি পড়ে রয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ দিশেহারা, শুধু এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ার প্রশ্নেই নয়, কোভিড-উত্তর বিশ্ব নিয়েও তাদের একই রকম দশা। বিশ্ব কিন্তু একই রকম থাকবে না। আর্থিক রক্ষণশীলতার প্রাচীর সম্পর্কে গত ৪ঠা এপ্রিল লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস এডিটোরিয়াল বোর্ডকে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করতে দেখা গেছে: "বিগত চার দশক ধরে যে নীতি নিয়ন্ত্রণ করছে, আমূল সংস্কারগুলি তার অভিমুখ বদলে দেবে- যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় ভূমিকা সরকারকে মেনে নিতে হবে। সরকারী পরিষেবাগুলিকে তাদের অবশ্যই দায়ভারের বদলে বিনিয়োগ হিসাবে দেখতে হবে। পুনর্বন্টনের বিষয়টিকে আবার অ্যাজেন্ডায় নিয়ে আসতে হবে। বহুকাল ধরে যারা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে তাদের এবং ধনীদের সুযোগসুবিধাগুলো আজ প্রশ্নের মুখে। নীতিগুলিকে ভিন্ন কেন্দ্রমুখী হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, যেমন মৌলিক আয় এবং সম্পদ বিষয়ক করগুলিকে মিশিয়ে দিতে হবে।"

তাই, কোভিডের বিরুদ্ধে কেরালার এই লড়াই,শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য দুর্বল অংশের জীবনজীবিকা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়টি

সুনিশ্চিত করার জন্য দেশের বামপন্থীদের সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করবে। যা আগামী দিনগুলিতে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে।

বাস্তবিকই এটা একটা ধ্যানধারনার লড়াই, রাজনৈতিক ধ্যানধারনার লড়াই। ভারতে গত তিন দশক ধরে নয়া উদারবাদের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে, তা দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। সে'কারনে, মহামারী এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য এই লড়াইকে নীতিগত দৃটিভঙ্গি বদল ঘটানোর জন্যও পরিচালনা করতে হবে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বভাব-বিরোধী অবস্থান এবং বিজ্ঞানের পক্ষে লড়াই বামপন্থীদের মহামারী মোকাবিলার প্রশ্নে আরো বেশি যোগ্য করে তুলেছে। এই মৌলিক বাস্তবতাকেই কেরালা তুলে ধরেছে।

একটি বিখ্যাত চিকিৎসা তত্ত্ব হলো- রুডলফ ভিরচাও বলেছিলেন, "ওষুধ একটা সমাজ বিজ্ঞান, বড় করে দেখলে রাজনীতি ওষুধ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জন্য যেমন বিজ্ঞান, তেমনই সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার তাত্ত্বিক সমাধানের চেষ্টা করাটাই সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে ওষুধের দায়বদ্ধতা: রাজনীতিবিদ, যাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদ, তাঁদের অবশ্যই এসবের সঠিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে.......বিজ্ঞান, যাকে নিজের কারণেই মানুষের জন্য বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি কিছু ভাবা হয় না, তাকেও এই বিষয়টা অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান কর্মদ্যোমকে সমর্থন দিতে পারে না, এমনটা সঠিক নয়- ......যদি ওষুধ তার মহান দায়িত্ব পালন করে, তবে সে অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে.....চিকিৎসকরা হলেন গরিবের স্বাভাবিক উকিল (এটর্নি)....."। ভারতের বামপন্থীরা হলেন, এই বোঝাপড়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তা সে দপ্তরেই হোক কিংবা বাইরে, ভারতীয় জনগণকে রক্ষার জন্য, বিশেষ করে শ্রমিক এবং দুর্বল অংশের মানুষের জন্য, তাঁরা তাঁদের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা খেয়াল করা প্রয়োজন। কারণ, অহেতুকভাবেই আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ব্রাজিলের অতি ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার তরফে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে দারিদ্রতা এবং একগুঁয়েভাবে চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য সর্বনাশা পরিনতির জন্ম দিচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে এটা বিশ্বজুড়েই মহামারীর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াইয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। তা সে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবাই হোক কিংবা জেরেমি করবিন এবং বার্নি স্যান্ডার্স। ভারতেও এই রাজনৈতিক মাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেরালা তার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদ: সত্যেন সরদার

পুঁজি, পরিবেশ ও করোনা মহামারী

অরুণাভ মিশ্র

জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে, শহরের দিকে তাকিয়ে আছে রিও। মনে করার চেষ্টা করছে প্লেগ নিয়ে কখন কি পড়েছে। আস্তে আস্তে স্মৃতিতে ভেসে উঠল ইতিহাসের পাতা। ওগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে ও দেখল আজ পর্যন্ত তিরিশটা বড বড় প্লেগ এসেছে পৃথিবীতে। মারা গেছে দশ কোটিরও মতো মানুষ। মনে পড়ল কনস্ট্যান্টিনোপল-এর প্লেগের কথা, একদিনে দশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল ওখানে।

সত্তর বছর আগে ক্যান্টনে দেখা দিয়েছিল প্লেগ। মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ার আগে মরেছিল চল্লিশ হাজার ইঁদুর। লাশে ভরে গিয়েছিল এথেন্স

নগরী, কাকপক্ষীরাও পালিয়েছিল শহর থেকে। ফ্রান্সের মার্সাই শহরে বিরাট বিরাট গর্তে গলিত লাশ ছুঁড়ে মেরেছিল কয়েদিরা।

প্রঁভে শহরে গড়ে তোলা হয়েছিল বিশাল প্রাচীর, যেন প্লেগের দূষিত বাতাস ঢুকতে না পারে শহরের ভেতর।

কনস্ট্যান্টিনোপলে আশ্রমগুলোয় শতচ্ছিন্ন খড়ের গদির ওপর ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য গলিত শবদেহ। বিছানা থেকে আঁকশির সাহায্যে টেনে তুলতে হয়েছিল ওগুলো।

'দি প্লেগ' নামে আলবেয়ার কামুর কালজয়ী উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করলাম উপরের অংশটি। ফরাসি উপনিবেশ আলজেরিয়ার ওরাও শহর ঘিরে এই উপন্যাসে একদিকে প্লেগ তার মহামারী চরিত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিদিন আর অন্যদিকে ডাক্তার ভিও, যিনি সব বাধা সরিয়ে লড়ে চলেছেন এই রোগের সঙ্গে গ্রাম, তারিউ, ফাদার প্যানালু আর রাবেয়াদের সঙ্গে নিয়ে। মারা যায় তারিউ, প্যানালু। বহুদিন পর প্লেগের প্রকোপ কমে। শহরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আতসবাজির ঝলকের মধ্যে উপন্যাসের শেষে কামু লেখেন—

'দূর শহর থেকে ভেসে আসা তুমুল হর্ষধ্বনি শুনতে শুনতে রিও ভাবল, মানুষের এই বিজয় উল্লাস যে কোনদিন আবার হয়তো বিপন্ন হবে। সেটাই হয়তো নিয়ম। কেননা প্লেগের জীবাণু কখনোই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, অদৃশ্যও হয় না চিরতরে। বছরের পর বছর এই জীবাণু সুপ্ত থাকে আসবাবপত্রের মাঝে, কাপড়চোপড়ের বাক্সের ভেতর। ওত পেতে অপেক্ষা করে শোবার ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, বড় বড় ট্রাঙ্ক, বইয়ের শেলফে, তারপর সেই দিনটি আসে যেদিন এই জীবাণু মানুষের সর্বনাশ এবং শিক্ষার জন্য আবার তার ইঁদুরগুলোকে জাগিয়ে উত্তেজিত করে মরবার জন্য, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরকে পাঠিয়ে দেয় আনন্দমুখর কোন শহরে।'

না সেই প্লেগ আবার ফিরে আসেনি যেমনি কামু বলেছেন। ফিরে এসেছে এক নতুন ধরনের ফ্লু।

(২)

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখটা। ঐ দিন চীনের উহান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে প্রথম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানতে পারে যে, সেখানে হঠাৎ কোনও কারণে গুচ্ছ গুচ্ছ নিউমোনিয়ার রোগী পাওয়া যাচ্ছে। পরে দেখা যায় এটা এক বিশেষ ধরনের

করোনা ভাইরাস, যাকে সার্স কোভ-২ বা কোভিড-১৯ বলে চিহ্নিত করা হয়। ১২ জানুয়ারি, ২০২০ চীনের সরকার এই সার্স কোভ-২ র জিন-সিকোয়েন্স সমগ্র পৃথিবীর জনতা জানতে পারবে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উহানে ফিল্ড ভিজিট করে ২০ ও ২১ জানুয়ারি। ২৮ জানুয়ারি আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি উচ্চপর্যায়ের দল পরিস্থিতি বুঝতে বেজিং যায়। ৩০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকরী কমিটির মিটিং হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে কোভিড-১৯ বা করোনা রোগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সে বিষয়ে হু ৩ফেব্রুয়ারি, ২০২০-তে একটি কৌশলের রূপরেখা বিশ্বাবাসীকে জানিয়ে দেয়। সেই কৌশলের মূল কথা ছিল সার্স কোভ-২ ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, কাশি বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে সূক্ষ্ম জলকণা বেরোয় তার মধ্য দিয়ে ছড়ায় এবং এই অসুস্থ রোগীর সংস্পর্শে যারাই আসেন তাদের এই অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অসুস্থ মানুষ থেকে বা সম্ভাব্য অসুস্থ ভেবে সবার থেকেই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, অসুস্থদের মুখ-ঢাকনা বা মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ঘন ঘন সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। হাঁচি, কাশি পেলে মুখ ঢেকে তা করতে হবে। জনবহুল এলাকা এড়িয়ে যেতে হবে। এক জায়গায় অনেকের জড় হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে এই অসুখ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। বহু দেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনও বহু দেশেই এভাবে দিন কাটছে। কোনও কোনও দেশে কিছু কিছু কাজকর্ম শুরু হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে অতিমারী অভিধা দিয়েছে। আজ ১৫ মে পেরিয়ে, অর্থাৎ ঠিক সাড়ে চার মাস পরে, গোটা বিশ্বে এবং বিভিন্ন উন্নত দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশেও আক্রান্ত এবং মৃত মানুষের একটি হিসাব নিচের

১২ জানুয়ারি, ২০২০ চীনের সরকার এই সার্স কোভ-২ র জিন-সিকোয়েন্স সমগ্র পৃথিবীর জনতা জানতে পারবে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেয়

টেবিলে দেওয়া থাকল। এই সংখ্যাতত্ত্ব সমগ্র বিষয়টির গভীরতা বোঝাতে যথেষ্ট হবে।

দেশ/বিশ্ব	আক্রান্ত (সংখ্যায়)	মৃত (সংখ্যায়)
সমগ্র বিশ্ব	৪৬,৬১,৯৭৪	৩,০৯,৭৭০
ইউ স্টেটস অব আমেরিকা	১৪,৮৭,০৭৬	৮৮,৬০৩
স্পেন	২,৭৬,৫০৫	২৭,৫৬৩
ইতালি	২,২৩,৮৮৫	৩১,৬১০
ফ্রান্স	১,৭৯,৫০৬	২৭,৫২৯
জার্মানি	১,৭৫,৬৯৯	৮,০০১
ইউনাইটেড কিংডম	২,৪০,১৬১	৩৪,৪৬৬
টার্কি	১,৪৬,৪৫৭	৪,০৫৫
ব্রাজিল	২,২০,২৯১	২,০৬৮
ইরান	১,১৮,৩৯২	১,৭৫৭
চীন	৮২,৯৪১	৪,৬৩৩
পাকিস্তান	৩৮,৭৯৯	১,৫৮১
ভারত	৮৬,৫৯৫	২,৭৬০

আজ অবধি পৃথিবীর ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই অসুখ। তাই এর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রাসী ভাব খুবই স্পষ্ট! মৃত্য হার ১ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশ অবধি ভিন্নতায় ভরা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ভাইরাসটির অনেক ক্ল্যাভ বা সাবগ্রুপ থাকলেও একটাই স্ট্রেন।

(৩)

এমন মহামারী পৃথিবীতে নতুন নয়। অনেক আগে গেলে অনেক নজির হয়তো পাবো, কিন্তু লেখা ভারাক্রান্ত হবে। যে প্লেগের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই বিউবোনিক প্লেগ শেষবার হানা দিয়েছিল আঠারো শতকে। ১৭২০-১৭২৩ প্রথম ধাপে, যাকে মূলত মার্সেইল্লে প্লেগ বলে, আর ১৭৭০-১৭৭২ দ্বিতীয় ধাপে, যার নাম দেওয়া আছে রাশিয়ান প্লেগ। উনিশ শতকের প্রথম ধাপ এশিয়ান কলেরার। ১৮২০ সালে ১লক্ষ মানুষের জীবন নিয়েছিল এই মারণ রোগ। আর শেষ ধাপে অতিমারীর রূপ নিয়ে হয়েছিল ফ্লু। ১৮৮৯-১৮৯০-তে রাশিয়া থেকে শুরু হয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এই অসুখ।

আর প্রাণ নিয়েছিল দশ লক্ষেরও বেশি মানুষের। কলেরা শুনলে পক্স বা বসন্ত রোগের কথা এসে পড়ে। গুটি বসন্তের বড় মহামারী বিশ্ব দেখেছিল ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে, যখন কয়েক কোটি মানুষ মৃত্যুর মুখ দেখেছিল সেই অসুখে। শতাব্দীতে এক দুবার এমন মহামারী বা অতিমারী দেখা গেলেও বিশ শতক থেকে তার পরিমাণ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। ১৯১৮-১৯২০ স্প্যানিশ ফ্লুর কবলে পড়ে প্রায় ৫০ কোটি বিশ্ববাসী। এদের পাঁচভাগের একভাগই মারা পড়েছিল। তার সামান্য আগে, ১৯১৬-তে আমেরিকান পোলিও রোগও কম জ্বালায়নি! তারও আগে বিশ শতকের একদম গোড়া থেকেই টাইফাস ছিল মহামারী। ১৯২০ সালে রাশিয়ায় যখন গৃহযুদ্ধ চলছে তখনকার একটা হিসাব দেখায় ৩০লক্ষ রাশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে এই অসুখে। ১৯০৩ সাল থেকেই চার্লস নিকোল টাইফাস নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনিই দেখিয়েছিলেন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে একরকম উকুন এই রোগ ছড়ায়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতে বিপ্লবকে রক্ষার জন্য লেনিন এই উকুন মারার ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৫৭-১৯৫৮-তে এশিয়ান ফ্লু অতিমারীর আকার নিয়ে ১লক্ষ ১৬ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়েছিল। আর বিশ শতকের একদম শেষপর্বে এসে হানা দিয়েছিল এইডস। এর প্রকোপ তো এখনও চলছে।

একুশ শতকের পাঁচ ভাগের একভাগও পুরো পেরোইনি আমরা। তার মধ্যেই সার্স (২০০২-২০০৩), সোয়াইন ফ্লু (২০০৯-২০১০), মার্স (২০১৫), ইবোলা (২০১৪-২০১৬), জিকা (২০১৫) প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণ লেগেই আছে। আবার নতুন ধরনের এক ফ্লু অতিমারী ডেকে এনেছে, ২০১৯-এর শেষ দিনগুলি থেকে এক নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস, সার্স কোভ-২। বিশ্ব আর একুশ শতকজুড়ে এই মহামারী আর অতিমারীর আক্রমণ যে যথেষ্ট বেড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, কেন এমন হলো ? আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপকতম উন্নতি সত্ত্বেও এমনটা ঘটছে, এটাও মনে রাখা দরকার।

(৪)

'আহা, সে সব কথা পরে শোনা যাবে!' জগু অধৈর্যের মতো বলল, 'আগে বলুন এসব খুদে জানোয়ারদের চেহারা কী রকম ?

'ওঃ, সে নানান রকম চেহারা', ভদ্দরলোক বলে চলল, 'কারুর চেহারা সরু সুতোর মতো লম্বা, কেউ কেউ ঠিক ফুলের মতো গোল,

এমনকি মাঝখানে যেন পাপড়ির দাগ! কারুর বা লোমে ভর্তি, কারুর মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কারুর মাথায় শুধু একটা ঝুঁটি। আবার কেউ কেউ একেবারে বেয়াড়া রকমের তেকোণা, কারুর বা দু'দিকে দুটো লেজ। কেউ কেউ থাকে দঙ্গল পাকিয়ে, একজোট হয়ে, কেউ কেউ আবার পরস্পরের লেজ আঁকড়ে ধরে সরু চেনের মতো ঝোলে। এইরকম নানান ধরনের সব চেহারা! দেখতে দেখতে তাক লেগে যায়।''

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'খুদে শয়তানের রাজত্ব' বই থেকে তুলে ধরলাম উপরের অংশটা। দেবীপ্রসাদ ১৯৪৯'র ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ আজ থেকে ৭১ বছর আগে জীবাণুদের জগতের হাল হকিকত তুলে ধরে আমাদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। জীবাণুদের মধ্যে ভাইরাসরা আবার অদ্ভুত। প্রাণের সংস্পর্শে এসে তারা প্রাণীর মতো আচরণ করলেও প্রাণহীণ মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায় না। এরা আবার মানুষ-জীবজন্তু-গাছপালা সবার মধ্যেই রোগ সংক্রমণ ঘটায়। প্রোটিনের ঠোঙায় মোড়া ডিএনএ বা আরএনএ নিয়ে তাদের অতি সরল গঠন। অত সরল গঠন হলে কি হবে, ঐ একরত্তি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে জীবন্ত কোষের মধ্যে ঢোকা, বেরনো, যেখানে বংশবৃদ্ধি, নানারকম প্রোটিন তৈরি করা, ইত্যাদি বিষয়ে সব তথ্যই। সেই অনুযায়ী ওরা কাজ করে যায়। কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের আলোচ্য স্ট্রেনটিতে রয়েছে বাইরে গ্লাইকো প্রোটিন স্পাইক বা ভেতরে আরএনএ। এই দুয়ের মাঝখানে একটা লিপিড স্তর, যা ভাইরাসটির অন্যান্য অংশকে ধরে রাখতে পারে। তাই সার্স, কোভ-২ একটি আরএনএ ভাইরাস। শরীরে ভিতরে গিয়ে প্রতিলিপি তৈরির মধ্যে দিয়ে এ বংশবিস্তার ঘটায়। প্রতিলিপি তৈরির সময় জিনের ক্রম পরীক্ষা করার কোনও 'প্রুফ রিডিং' ব্যবস্থা এতে নেই। ফলে জিনের ক্রমে ছোটখাট হেরফের থেকে যায় অনেক সময়। এগুলো কোনও মিউটেশান নয়। জিনক্রমের মজ্জা বদলের ধরনধারণ দেখে ১৩টি ক্ল্যাডকে চিহ্নিত করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

মানবজীবনে ক্ষতিকর এই ভাইরাসগুলো মশা, মাছি, পাখি, বাদুড়, প্যাঙ্গোলিন, শুকর প্রভৃতি প্রতঙ্গ বা প্রাণীবাহিত হয়ে চলে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মানুষ নতুন নতুন প্রাণীকে খাদ্য তালিকায় আনছে। আবার ক্রমশ জঙ্গল সঙ্কুচিত করে আবাসন, হোটেল, শিল্প, ট্যুরিজম ইত্যাদির ব্যবস্থা বন্য প্রাণীদের লোকালয়ে টেনে আনছে। তৈরি হচ্ছে মানুষ-প্রাণীকূল

সংঘাতের নতুন নতুন ক্ষেত্র। সেই সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে যেভাবে আঘাত বাড়ছে তাও এই ক্ষুদ্র জীবাণু জগতে কোনও অভিঘাত যে তৈরি করেছে তা বলাই বাহুল্য। ক্রমশ বেড়ে চলা ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

(৫)

বিশ শতক আর একুশ শতকের ইতিহাস পণ্য সভ্যতার ইতিহাস। উন্নয়নের যে কোনও ঘটনায় আমরা পরিবেশে তিনভাবে ছাপ রেখে যাই। প্রথমত, প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ বা কাঁচামাল সংগ্রহ করি। ফলে পরিবেশে খানিকটা শূন্যস্থান তৈরি হয় – যা আগে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ঐ কাঁচামাল বা প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় নতুন বস্তু বানাই। এই নতুন বস্তুটি হলো পরিবেশে নব-সংযোজন। এ আগে ছিল না পরিবেশে। আর তৃতীয়ত, এই নতুন বস্তুটি বানাতে গিয়ে অনেক বর্জ্য পদার্থ তৈরি করি আমরা। এই বর্জ্য পদার্থগুলোও আগে প্রকৃতির ছিল না। সুতরাং প্রকৃতি তিনভাগে হস্তক্ষেপের কবলে পড়ল তা বলা যায়। একটি প্রাকৃতিক দ্রব্যের ক্ষয় এবং দুটি নতুন জিনিসের আমদানি। উন্নয়নের প্রয়োজনে আমাদের প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করতে হলেও আমরা তা এমনভাবে করার কথা ভাবি যাতে পরিবেশে যতটুকু হস্তক্ষেপ হবে পরিবেশ তার নিজস্ব কৌশলে সে আঘাত সয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকেই আমরা পুঁজি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ দেখে আসছি। এক সময় তো দেখেছি পুঁজিওয়ালা দেশগুলোঅন্য দেশগুলোকে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে রাখতো। উপনিবেশের দেশগুলো থেকে যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে নিয়ে গিয়ে তারা ভোগ্য পণ্য ও যন্ত্রপাতি বানিয়ে যেমন নিজেরা নিত, তেমনি উপনিবেশ দেশগুলোতেও বিক্রি করত। এভাবে তারা আরও পুঁজি বাড়িয়ে নিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু দেশ যখন স্বাধীন হয়ে গেল, তখন পুঁজিওয়ালা দেশগুলো কৌশল বদলে নতুন সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে ঋণ দিতে শুরু করল। চড়া সুদে ঋণ। সেইসঙ্গে নিজেদের পরিত্যক্ত পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর প্রযুক্তিগুলোও চালান করা শুরু করল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এতে তাদের পুঁজি আরও স্ফীত হলো। সেই পুঁজি তারা ভোগ্যপণ্য প্রসাধনী, তথ্য প্রযুক্তি, চাষবাস ও খাবারদাবার বানানোর কৌশল প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র লাভ বা

মুনাফার স্বার্থে কাজে লাগাতে শুরু করল। এইসব প্রযুক্তি ও পণ্য যাতে গোটা বিশ্বে বাজার পায় তাই তারা নিয়ে এল বিশ্বায়নের ধারণা। সেই বিশ্বায়নের ছাতায় উন্নত দেশের বড় বড় কারখানার টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ঘর ঠান্ডা রাখতে যন্ত্র, ওষুধ, বীজ, মোটরগাড়ি প্রভৃতি হরেক জিনিস থেকে গৃহস্থালির ক্ষুদ্র জিনিসও পৌঁছে গেল তৃতীয় বিশ্বের বাজারে। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ও অসদ্ভাবের আবহাওয়া জিইয়ে রেখে চাঙ্গা করে রাখা হলো যুদ্ধাস্ত্রের বাজার। আর এসব পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে তুলে নেওয়া হলো। শক্তির ব্যবহার হলো বহুগুণ। ফলে মুষ্টিমেয়র অপরিমেয় সম্পদ-লালসা মেটাতে ক্রমে প্রকৃতি হয়ে যাচ্ছে নিঃস্ব। তার নদী-সমুদ্র-বাতাস হয়ে উঠেছে দূষিত। তাপ বেড়েছে আবহমণ্ডলে। হারিয়ে যাচ্ছে বন, জীববৈচিত্র। কোটি কোটি টন উর্বর মাটির ক্ষয় হচ্ছে, বাড়ছে মরুভূমি। এককথায় এই পণ্য সভ্যতা গোটা পৃথিবীর পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে ধ্বংস করে চলেছে। আর তার প্রভাব বিষয়ে যতো সতর্কতা – সব যেন ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

দুটো সতর্কবার্তা কথা শোনাই। প্রথমটা ফিদেল কাস্ত্রোর। আজ থেকে ২৫ বছর আগে কাস্ত্রো তাঁর 'Tomorrow is too late' বইটা শুরুই করেছিলেন যে কথা দিয়ে তা তাঁর ভাষাতেই শোনাই :

"...An important biological species –humankind-is at risk of disappearing due to the rapid and progressive elimination of its natural habitat. We are becoming aware of this problem when it is almost too late to prevent it. If must be said that consumer societies are chiefly responsible for this appalling environmental destruction.

ধারাবাহিকভাবে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করার ফল হিসাবে মানবকুল যে পৃথিবী থেকেই হারিয়ে যেতে পারে, এবং তেমন সম্ভাবনা যে তৈরি হয়ে গেছে সে চেতাবনি ছিল কাস্ত্রোর কথায়। 'Humankind-an endangered species' এই শিরোনামের অধ্যায়ের প্রথম স্তবকেই ছিল পণ্য সভ্যতার আতঙ্ক জাগানো পরিবেশ ধ্বংসের কথা। তারই ফল হিসাবে মানুষ এক বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছে এই ছিল তাঁর মত। সে কথাকে অবহেলাই করা হয়েছে। ১৯৯২'র রিও-সামিটে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন এ থেকে মুক্তির উপায়। বলেছিলেন "অবসান

হোক স্বার্থমগ্নতার, তাচ্ছিল্যবাদের, সংবেদনশীলতা হীনতার, দায়িত্বহীনতার, আর প্রবঞ্চনার। যার জন্ম দিয়েছে এই শিল্প সভ্যতা আর পণ্য সভ্যতা। ‘‘তাও কাকস্য পরিবেদনা!

দ্বিতীয় যে সতর্কবার্তার কথা বলব তাও ধনবাদী সংস্কৃতির পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল আজ থেকে ১০৭ বছর আগে। মার্কসের বন্ধু প্রাণীবিজ্ঞানী এডউইন রে ল্যাঙ্কেস্টারও আওয়াজ তুলেছিলেন ১৯১৩ সালে, অর্থাৎ সাইলেন্ট স্প্রিং প্রকাশেরও পঞ্চাশ বছর আগে। ‘Effacement of nature by man’ লেখায় ল্যাঙ্কেস্টার যুগপৎ সত্য ও বর্বর মানুষকে দায়ী করেছিলেন জীবকুলের অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংস, তাদের বাসভূমি নষ্ট করা, নদী দূষিত করা, বন ধ্বংস করার মতো কাজের জন্য। অমিত লোভে ধনবাদী সংস্কৃতি যে প্রাকৃতিক সম্পদকে চেটেপুটে নিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে ল্যাঙ্কেস্টারের কলম। সে কথা যে কানে যায়নি বলাই বাহুল্য। এমনকি রাচেল কারসন যখন যথেষ্ট কীটনাশক প্রয়োগের অবিবেচক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন তখন তাকে ‘সম্ভবত একজন কমিউনিস্ট’ এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শিল্পমহল শুধু নয়, আমেরিকার কৃষি দপ্তরও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটা কথা অবশ্য ঠিক, প্রকৃতিকে অনিয়ন্ত্রিত দোহন এবং পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরাই প্রথম থেকে সোচ্চার থেকেছে। রাচেল ছিলেন, তাদের কাছে, শিল্পপুঁজির বিকাশে অন্তরায়।

(৬)

প্রকৃতি আর মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা ক্যাপিট্যালের পাতায় তুলে ধরেছেন কার্ল মার্কস। লিখেছেন –

‘‘...ভূমি (এবং অর্থনীতিতে জল ও তার অন্তর্ভুক্ত), কুমারী অবস্থায় যা মানুষকে জোগায় প্রাণধারণের আবশ্যিক দ্রব্য সামগ্রী বা উপায়সমূহ – সেই ভূমির অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ এবং তা মনুষ্য শ্রম প্রয়োগের সর্বজনীন বিষয়। সেই যাবতীয় সামগ্রী, যেগুলিকে শ্রম কেবল পরিবেশের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে – সেই যাবতীয় সামগ্রীই হচ্ছে প্রকৃতির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত শ্রম প্রয়োগের বিষয়। যেমন মাছ, যা আমরা ধরি এবং জল থেকে তুলে নিই; কাঠ, যা আমরা বন থেকে কেটে আনি; এবং আকর, যা আমরা খনি থেকে তুলে আনি। অপর পক্ষে,

গাছ কেটে সাফ করা হচ্ছে আমাজন

শ্রমের বিষয়টি যদি হয়, বলা যায়, পূর্বকৃত শ্রমের মাধ্যমে পরিস্রুত, তা হলে তাকে আমরা বলি কাঁচামাল, যেমন ইতিপূর্বে তুলে আনা আকর যাকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ধৌত করার জন্য। সমস্ত কাঁচামালই শ্রম প্রয়োগের বিষয়, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রম প্রয়োগের বিষয়ই কাঁচামাল নয়, তা কাঁচামালে পরিণত হয় শ্রমের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে।

শ্রমের উপকরণ হচ্ছে এমন একটি জিনিস বা একাধিক জিনিসের সংখ্যাবিন্যাস (কমপ্লেক্স) যাকে শ্রমিক স্থাপন করে তার নিজের এবং তার শ্রম প্রয়োগের বিষয়ের মধ্যস্থলে এবং যা কাজ করে তার সক্রিয়তার পরিবাহী হিসাবে। অন্যান্য বস্তুকে তার উদ্দেশ্যের বশবর্তী করার জন্য সে ব্যবহার করে কিছু বস্তুর যান্ত্রিক, দৈহিক ও রাসায়নিক গুণাবলিকে। গাছের ফলের মতো প্রাণধারণের এমন তৈরি জিনিস ইত্যাদিকে, যেগুলি সংগ্রহ করতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কাজ করে শ্রমের উপকরণ হিসাবে, সেগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখলে, যে জিনিসটিকে মানুষ প্রথম করায়ত্ত করে, সেটি তার শ্রমের বিষয় নয়, শ্রমের উপকরণ। এইভাবে প্রকৃতি পরিণত হয় তার একটি কর্মেন্দ্রিয়ে, যাকে সে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নেয় এবং এইভাবে বাইবেলের বাণী সত্ত্বেও, নিজের উচ্চতাকে বৃদ্ধি করে নেয়। যেমন পৃথিবীই হচ্ছে মানুষের প্রথম ভাঁড়ার ঘর, তেমনি পৃথিবীই হচ্ছে তার প্রথম হাতিয়ারখানা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পৃথিবী তাকে জোগায় পাথর, যা সে ব্যবহার করে ছোঁড়ার জন্য, পেষার জন্য, চাপ দেওয়ার জন্য, কাটবার জন্য। পৃথিবী নিজেই শ্রমের একটি উপকরণ, কিন্তু যখন সে কৃষিকার্যে এইভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রয়োজন হয় গোটা এক প্রস্ত উপকরণের এবং শ্রমের অপেক্ষাকৃত উচ্চবিকশিত মানের।”

প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে কাঁচামাল থেকে পণ্য হয়ে ওঠে মানব শ্রমের অংশগ্রহণে তা সহজে বুঝিয়ে দিলেন মার্কস। আর একই সঙ্গে আমাদের দেখালেন মানুষ আর প্রকৃতির নিবিড়তম সম্পর্কের রূপটিকেও। মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গ যেমন, তেমনি প্রকৃতিও মানুষের এক আবশ্যিক অঙ্গ, তার কর্মেন্দ্রিয়। উভয়ের এই জটিল আন্তসম্পর্কই পরিবেশ চর্চার মূল ভিত্তি গড়ে দেয়। পণ্যায়নের হার বাড়িয়ে, প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ অনিয়ন্ত্রিত করলে এই সম্পর্কের সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

এসব ধারণা মার্কসের আপনা আপনি আসেনি। প্রকৃতি বিজ্ঞানের এবং কৃষি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো তিনি গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছেন ক্যাপিট্যাল লেখার পর্বে। শোরলেমার করা ‘টেক্সটবুক অন কেমেস্ট্রি’র জার্মান সংক্ষিপ্তসার পড়েছেন। সেই সময় এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিতে দেখি কৃষিবিজ্ঞানের বিষয়ে কী তার অগাধ জিজ্ঞাসা। লিখেছেন – “আমি শোরলেমার কাছে জানতে চাই জার্মান ভাষায় কৃষি রসায়নের সর্বাধুনিক ও সর্বোত্তম বইটি কি ? সেই সঙ্গে খনিজ সার আর নাইট্রোজেন সার বিষয়ে এখনকার দুই বিবাদী পক্ষের পারস্পরিক যুক্তিগুলো কি কি? (সবশেষে যখন আমি এই বিষয়ে চর্চা করেছিলাম তখন দেখেছি জার্মানিতে এক্ষেত্রে অনেক নতুন ভাবনা এসেছে)। তিনি কি লিবিগের ‘Soil Exhaustion Theory’র বিরুদ্ধ ভাষ্য দেওয়া কোনও জার্মান বিজ্ঞানীর কথা জানেন? মিউনিখের কৃষিবিজ্ঞানী ফ্রান্স (Frass)-এর অ্যালুভিয়ান থিয়োরি সম্পর্কে কিছু কি তাঁর জানা আছে? ‘Ground rent’ বিষয়ক অধ্যায়ের জন্য এ বিষয়ের সর্বশেষ অবস্থা এবং জিজ্ঞাসাগুলো আমার জানা থাকা দরকার।”

এসব জেনে ক্যাপিট্যালের পাতায় যুক্ত করেছিলেন মেটাবলিক রিফ্‌টের ধারণা, ১৮৪০-এ প্রকাশিত হয়েছিল জাস্টাস ভন লিবিগের ‘অরগানিক কেমেস্ট্রি ইন ইটস অ্যাপ্লিকেশান টু এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফিজিওলজি’ যাকে সংক্ষেপে অনেকে এগ্রিকালচারাল কেমেস্ট্রিও বলে থাকেন। মার্কস এই বই পড়ে বুঝতে পারেন জমির উর্বরতা ধরে রাখার উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ (NPK) কিভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা নেয়। প্রতিটি উৎপাদন পর্বে জমি তার উর্বরতা হারায়, বা বলা যায় উর্বরতা শোষিত হয়। খাবার আর বস্ত্র হিসাবে মাটির যে যে উপাদান ফসলের মধ্য দিয়ে তুলে নেওয়া হলো ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সেই উপাদানগুলোকে আবার জমিতে

ফিরে যাওয়ার পক্ষে মানুষই বাধা দেয়। তার ফলে ধনতন্ত্র জমির উর্বরতা রক্ষার শর্তগুলোকে মানে না। এখান থেকে মার্কস সিদ্ধান্ত টানেন ধনবাদী উৎপাদন মানুষ ও প্রকৃতির ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া এক জটিল ও সক্রিয় লেনদেন (মেটাবলিজম) প্রক্রিয়ায় বিচ্ছেদ তৈরি করে। জমির উর্বরতার ধারাবাহিক ক্ষয় যেমন সেখানে একটা বিষয়, তেমনি, জমির উঠিয়ে নেওয়া উপাদানগুলোর ভিন্ন রূপে ব্যবহারও পরিবেশে দূষণ ডেকে আনে। এভাবেই মানুষ তার বস্তুতন্ত্রের সমস্যা ডেকে আনে। মার্কস বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের দ্বন্দ্ব তাই চরম ও অমীমাংসক।

সহজ করে বললে, মার্কসের ভাবনায়, বড় শিল্পক্ষেত্র আর কৃষিক্ষেত্র সর্বত্র আমরা একই জিনিস দেখি। শিল্প পণ্যের সঙ্গে বর্জ্য তৈরি হয়, আর তা মানব শ্রমক্ষমতা নষ্ট করে। ফলে পরিবেশ যেমন দূষিত হয় তেমনি মানবশরীরও জীর্ণ হয়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে নষ্ট হয় মাটির উর্বরতা ও কৃষি শ্রমিকের শারীরিক সক্ষমতা। মার্কস বলছেন, শ্রম আর জমির ডাকাতি। বলেছেন –

"...All Progress in capitalist agriculture is a progress in the art, not only of robbing the worker, but of robbing the soil, all progress in increasing fertility of the soil for a given time is a progress towards ruining the more long lasting sources of that fertility... capitalist production, therefore only develops the techniques and degree of combination of the social process of production by simultaneously undermining the original sources of all wealth – the soil and the worker."

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ধনবাদী উদ্যোগগুলো যে আদপে তার উর্বরতা ফিরে পাওয়ার প্রাকৃতিক চক্রেরই ক্ষতি করে দেবে সে কথা মার্কস বলে দিয়েছিলেন আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি আগে। জমি (আদপে প্রকৃতি) আর শ্রম– এই দুই মুখ্য সম্পদ উৎসকে অবজ্ঞা আর অবহেলা করে বেড়ে ওঠে যে ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তা যে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন মানবসমাজ আর তার বাস্তুতন্ত্রের হন্তারক হয়ে উঠবে তা তো বোঝাই যায়।

শুধু কৃষি নয়, মার্কস তাঁর 'Economic and philosophical manuscripts of 1844' এ দেখিয়েছেন, কিভাবে ব্রিটেনের শিল্প

শহরগুলো পুঁজিবাদী উৎপাদনের নেশায় পরিবেশ প্রতিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে চলেছে।

"The refinement of needs and of the means of fulfilling them gives rise to a bestial degeneration ... Even the need for fresh air ceases to be a need for the workers. Man reverts once more to living in a cave is now polluted by the mephitic and pestilential breath of civilization ...Light , air, etc. – the simplest animal cleanliness ceases to be a need for man. Dirt- this pollution and putrefaction of man, the sewage (this word is to be understood in its literal sense) of civilization – becomes an element of life for him."

হ্যাঁ, 'পাশব অবক্ষয়'! পরিবেশ আর বাস্তুতন্ত্রের এই পাশব অবক্ষয় ডেকে আনছে নিত্য নব চাহিদা আর তাকে পূরণ করার বিবিধ সব পথ। অথচ সেখানে শ্রমজীবী মানুষের নির্মল বাতাসটুকুর দাবি গৌণ। মার্কস বলছেন, সভ্যতার মহামারীতুল্য বিষাক্ত বাতাসে মোড়া অতীতের গুহার মতো আলো হাওয়া পরিচ্ছন্নতাহীন খুপরি ঘরের আবার বাসিন্দা হয়েছে মানুষ। এই দূষণের আর পচে ওঠা মানবতার নোংরা, এই সভ্যতার কাদাজল আজ তার জীবনের অঙ্গ। ধনবাদী উৎপাদনের সংস্কৃতি এটাই দেয়।

ধনবাদ শুধু মানুষকে শোষণ করে না, পৃথিবীকেও শোষণ করে। এই দুইয়ের স্বার্থকেই সে নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলে, মুনাফার সর্বগ্রাসী নেশায়। পণ্য তৈরিতে ক্রমাগত প্রকৃতি থেকে নেয় কাঁচামাল আর বাড়িয়ে চলে বর্জ্য। তাই ধনবাদকে উচ্ছেদ না করলে ব্যক্তি শোষণ যেমন বন্ধ হবে না, তেমনি বন্ধ হবে না পরিবেশকে ক্রমাগত রিক্ত করার দুরভিসন্ধি।

(৭)

প্রকৃতির সঙ্গে মানবসমাজের এই বিক্রিয়ার প্রকৃতি বা ধরন ধারণটা ঠিক কেমন হওয়া দরকার তা নিয়ে 'Part played by labour in transition from ape to man' এ কলম ধরেছিলেন ফেডরিখ এঙ্গেলস। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে স্বল্পমেয়াদি স্বার্থ আর লোভ কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা ডেকে আনে তা তুলে ধরতে লিখেছিলেন –

"আমরা মানুষেরা প্রকৃতির উপর যে বিজয় অর্জন করেছি তা নিয়ে

নিজেদের বেশি পিঠ চাপড়ানি দেওয়ার দরকার নেই। প্রতিটি বিজয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়। একথা ঠিক যে, প্রতিটি বিজয় প্রথমত, আমরা যে ফল চেয়েছিলাম, তা এনে দিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়ত এবং তৃতীয়ত, ভিন্ন, অপ্রত্যাশিত ফল দেখা দিয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে প্রথমটির নেতি ঘটিয়েছে। মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, এশিয়া মাইনর ও অন্যত্র যারা বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিযোগ্য জমি সংগ্রহ করেছিল, তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে বনের সঙ্গে জল সংগ্রহের কেন্দ্র বা আর্দ্রতার ভাণ্ডার সরিয়ে তারা ঐ দেশগুলির বর্তমান হতাশ পরিস্থিতির ভিত্তি স্থাপন করছে। আল্পসের ইতালীয়রা যখন উত্তরের ঢালে সযত্নে রক্ষা করলে দক্ষিণের ঢালের ফার বনকে কেটে সাফ করে ফেলে, তখন তারা জানতো না যে এর ফলে, তারা তাদের পার্বত্য ঝরনাগুলোর জল, বেশিরভাগ সময়ের জন্য কেড়ে নিচ্ছে। তার ফলে আবার বর্ষাকালে আরও তীব্রভাবে জলধারা সমতলভূমিতে থেকে আসে। ... এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে আমরা প্রকৃতির উপর সেই রকম শাসন না চালাই, যা কোনও বিজয়ী বিদেশি জাতির উপর চালানো হয়, যেন আমরা প্রকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে। বরং আমরা, আমাদের রক্ত মাংস ও মগজ সহ প্রকৃতির অঙ্গ; আমরা তার মাঝেই বিদ্যমান, এবং আমরা তার উপর প্রভুত্ব করার যে কথা বলি, তার বাস্তবতা এইটুকুই, যে অন্য সব প্রাণীর তুলনায় আমাদের সুবিধে আমরা তার নিয়মাবলি শিখতে ও সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারি।"

কিন্তু আশু মুনাফার লোভে ধনবাদ কোনও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ভাবনায় যায় না। নিজের যৌবনেই সবটুকু আগ্রাসী হয়ে গিলে নিতে চায় সে। তাই প্রকৃতির উপর আঘাত আসে। বাস্তুতন্ত্র বদলায়। প্রকৃতি ও মানব সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল যে সাম্য তা ঘুচে যায়।

কিন্তু আশু মুনাফার লোভে ধনবাদ কোনও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ভাবনায় যায় না। নিজের যৌবনেই সবটুকু আগ্রাসী হয়ে গিলে নিতে চায় সে

ফলে মানবসমাজ সমস্যার মুখে পড়ে। বিষয়টাকে রাচেল কারসনও এভাবেই দেখেছেন। তাঁরও মত :

"The balance of nature is not the same today as in Pleistocene times, but it is still there : a complex, precise and highly integrated system of relationships between living things which cannot safely be ignored any more than the law of gravity can be defined with impunity by a [person] perched on the edge of a cliff. The balance of nature is not a status quo; it is fluid, ever shifting, in a constant state of adjustment. [Humans], too [are] part of this balance.

এই যে মানবসমাজ ও প্রকৃতির জটিল ও পরিবর্তনশীল সম্পর্ক যা ক্রমাগত প্রকৃতির শোষণ ও অবক্ষয়ে মানবসমাজ ও অন্যান্য জীবকুলকে প্রবল সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে এ কেবল ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দার্শনিক আর পরিবেশবিদরাই বলেননি, বলেছেন সামনের সারির ১৫৭৫ জন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। ১৯৯২ সালে তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেছেন –

"Human beings and the natural world are on a collision course Human activities inflict harsh and often irreversible damage on the environment and on critical resources. If not checked, many of our current practices put at risk the future we wish for human society and the plant and animal kingdom and may so alter the living world that it will be unable to sustain life in the manner that we know Fundamental changes are urgent if we are to avoid the collision our present course will bring."

অর্থাৎ মানবকুল আর প্রকৃতি এক সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে এখন। পরিবেশ আর তার প্রধান সম্পদগুলোর উপর কঠোর আঘাত হানছে মানবসমাজের কর্মকাণ্ড, পরিবেশে ঘটিয়ে ফেলছে ত্রিমুখী ক্ষতি। তার ফলে জীবকুল আর উদ্ভিদকুল তো বটেই গোটা মানব সভ্যতাই সঙ্কটে পড়ে যাবে। এই সঙ্কট না চাইলে আশু কিছু মৌলিক বদল আনতে হবে আমাদের।

এসব না হয় বোঝা গেল। ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতি পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের তীব্রতম ক্ষতি করেছে, তা বোঝা গেল, কিন্তু এর সঙ্গে করোনার সম্পর্ক কোথায়?

(৮)

প্রকৃতি ও মানবসমাজের মধ্যে এক জটিল, সক্রিয়, লেনদেন-নির্ভর জীবন্ত সম্পর্ক তার বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয়। বাস্তুতন্ত্রের ক্রমাগত একটু একটু করে ভেঙে পড়ার কারণগুলো আমরা দেখলাম পুঁজি-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ফসল হিসাবে। ফলে মানুষ আর প্রকৃতির ভারসাম্যের পাল্লাটা আর সমান নেই, বিচ্ছিরিভাবে একপাশে হেলে পড়েছে। ফলে এই প্রকৃতি, যার মধ্যে কত সহস্র লক্ষ কোটি ভিন্ন ধরনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, যার কিছুমাত্র আমাদের জানা আর বহু অজানা। তারা এবার সক্রিয় হবে। ভাঙা বাস্তুতন্ত্রের ফাঁকফোকর দিয়ে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইবে। যে ছিল গহীন বনের ভেতরে, বন ধ্বংসে সে আজ বাইরে এসে মানব প্রতিবেশে জায়গা খুঁজবে। যে ছিল গভীর সাগরে, সাগর সেঁচা মানুষ তাকে এনে দেবে লোকালয়ে।

তেমনি করেই এসেছে আগে বহু ভাইরাস। তাই কোভিড-১৯ও ঐ পথ বেয়েই পুঁজিবাদী উৎপাদন সংস্কৃতির হাত ধরে আসবে স্বাভাবিক নিয়মে। অন্তত রব ওয়ালেস তাই মনে করেন। ২০১৬ সালে মহামারী বিশেষজ্ঞ এই বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী মান্থলি রিভিউ থেকে একটা বই বের করছিলেন। বইটার নাম ‘বিগ ফার্মস মেক বিগ ফ্লু’। এখানে তিনি দেখিয়েছেন নানান মারক ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আদপে পুঁজির বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফার্ম কৃষির শিল্পের রূপ নিয়ে বিস্তারকেই মূলত দায়ী করেছেন তিনি এজন্য। এই ফার্ম যুগপৎ কৃষিজ এবং প্রাণীজ পণ্য তৈরি করে। প্রাণী পালনের ফার্মগুলি আরও বেশি সমস্যার। রবের মতে, যখন নতুন কোনও মহামারী আসে তখন সরকার, মিডিয়া, চিকিৎসক আর ভাইরোলজিস্ট বা ব্যাকট্রোলজিস্টরা তাকেই মুখ্য গুরুত্ব দিয়ে দেখার আর প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। এর ফলে যে মূল কাঠামোগত কারণে ঐ ভাইরাস বা প্যাথোজেন এমন গুরুত্বের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারল তা ঢাকা পড়ে যায়।

ফার্ম কৃষি, যা কৃষিকে শিল্পের রূপ দিয়ে ফেলেছে সেটির সঙ্গে অন্যান্য জড়িত বিষয়গুলো হচ্ছে পুঁজির আগ্রাসন, জমি হাতিয়ে নেওয়া, মুখ্য বনাঞ্চল দখল, বন ধ্বংস আর অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন। এইসব ঘটনাক্রম বহু বাস্তুতন্ত্র ভেঙে দেয়, তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকা প্যাথোজেনগুলোকে মুক্ত করে দেয়। সেগুলো তখন স্থানীয় পশুপাখি থেকে মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

আবার গোটা পৃথিবীকেই আমরা একটা বড় ফার্ম ধরে নিতে পারি। সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বন ধ্বংস করছে ফার্ম কৃষির বিকাশের স্বার্থে। দুর্বল দেশগুলোর জমি ও সম্পদ হাতিয়ে নিয়েও হচ্ছে একাজ। ফলে বহু নতুন প্যাথোজেন, যা কেবল দুর্গম অঞ্চলে থাকত বলে বাস্তুতন্ত্রবিদরা জানতেন, তা এখন মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক কৃষির বদলে ফার্ম কৃষির বাস্তুতন্ত্রে এসে ঐ প্যাথেজেন মারক প্রকৃতির হয়ে উঠেছে, কারণ এ পরিবেশ তার প্রকৃতি বদলের জন্য আদর্শ। প্রাণী পালনে জেনেটিক মনোকালচার, একলপ্তে ব্যাপক সংখ্যায় প্রাণীদের মধ্যে ক্রমবিস্তারের সুযোগ তাদের দ্রুত মারক প্রকৃতি পেতে ইন্ধন হিসাবে কাজ করছে।

এই মতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়ে রব ও তার সঙ্গীরা মান্থলি রিভিউয়ের মে, ২০২০ সংখ্যায় ছেপেছেন তাদের নিবন্ধ "কোভিড ১৯ অ্যান্ড সার্কিটস অব ক্যাপিট্যাল"। গুরুত্ব বুঝে ২৭ মার্চেই এটি অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। এখানে রবেরা বলেছেন, আজ পর্যন্ত মোট মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের ষাট ভাগই এসেছে বন্য জন্তু থেকে, স্থানীয় প্রাণী বা মানুষের হাত ধরে। ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের জটিল বাস্তুতন্ত্র বহু মারক হিংস্র ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তা আজ বাইরে চলে আসছে ফার্ম কৃষিতে ক্রমাগত পুঁজি বিনিয়োগ, আর পৃথিবীজুড়ে বন ধ্বংসের কারণে। স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত থাকত আগে যে মারক ব্যাধি, তা আজ বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ও যাতায়াতে হয়েছে দ্রুত সঞ্চরণশীল।

ফার্ম এবং খাদ্যদ্রব্যে জন্মানো কয়েকটা প্যাথেজেন ও রোগ হলো আফ্রিকার সোয়াইন ফিভার, ক্যামলোব্যাকটর, ক্রিপ্টোস্কোরিডিয়াম, সাইস্ফোস্পোরা, ইবোলা রেস্টন, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ, লিস্টারিয়া, নিপাহ, সালামোনেলা, ইয়ারসিনিয়া এবং একগুচ্ছ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস –H1N1, H1N2V, HN2V, H5N1, H5N2, H5NC H7N1, H7N3, H7N7, H7N9 এবং H9N2। তাই কোভিড-১৯ ও যে ফার্ম কৃষির পুঁজি লালিত ফার্মে, অথবা পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীর ফার্মেই জন্মেছে তা সহজেই বলা যায়।

(৯)

অতএব করণীয়? একরকম করণীয়র ইঙ্গিত দিয়েছেন জন বেলামি ফস্টার তার 'ইকোলজি এগেইন্সট ক্যাপিট্যালিজম' বইতে। লিখেছেন –

We are faced with a stark choice : either reject "the gods of profit" as holding out the solution to our ecological problems, and look instead to a more harmonious co-evolution of nature and human society, as an essential element in building a more just and egalitarian social order or face the nature consequence on ecological and social crisis that will rapidly spin out of control, with irreversible and devastating consequence for human being and those for other numerous other species with which we are linked."

সুতরাং পথ হলো সংগ্রামের। আর সে সংগ্রামে মানবসমাজ আরও টেকসই, সমানাধিকার ভরা বিশ্ব সৃষ্টির জন্য। আর তার জন্য পুঁজিবাদকে বৈপ্লবিকভাবে হটানো ছাড়া পথ নেই। মুক্তি পেতে হবে সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাটোপ থেকেও। বিপ্লবকে বেছে নিতে হবে ধ্বংস না হতে চাইলে। আর সেটাই হবে মার্কস কথিত "...the inalienable condition for the existence and reproduction of the chain of human generations."

(১০)

"কলেরা মহামারী শুরু হবার দু'সপ্তাহ পরে ঐ সমাধিস্থলে আর মৃতদেহের স্থান সঙ্কুলান হলো না। গির্জাগুলিতেও আর জায়গা ছিল না, যদিও অনেক অনামী নাগরিক বীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহাবশেষ সাধারণ অস্থিসংরক্ষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্যা থিড্রালের নিচে অগর্ভস্থ সমাধিস্থানগুলি ভালো করে সিল গালা দিয়ে বন্ধ না করার জন্য সেখান থেকে ভাপ উঠে উপরের বাতাসের অদ্ভুত রকম হালকা করে দিয়েছিল আর তিন বছর অতিক্রান্ত হবার আগে ওর দরজাগুলি খোলা হয়নি। আর ওই সময়ের মধ্য রজনীর উপাসনার পর গির্জা ত্যাগ করার সময় ফারমিনা ডাজা খুব কাছ থেকে ফ্লোরেন্টিনো আরিজাকে প্রথম দেখতে পায়। তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কনভেন্ট অল সেইন্ট ক্লেয়ারের ভেতরের সব জায়গা থেকে শুরু করে পপলার বৃক্ষ শোভিত রাস্তাগুলি পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়, এবং তখন একটা সমাধি ক্ষেত্রের চাইতেও দ্বিগুণ বড় সর্বসাধারণের ফলের বাগানটি ব্যবহার করার দরকার পড়ে। তিন স্তরে মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য তিনটির মতো গভীর করে কবর খোঁড়া হলো, দেরি না করে এবং কফিন ছাড়াই, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে ফুলে ওঠা

মাটির নিচ থেকে স্পঞ্জের মতো রক্ত কাদা উঠে আসতে দেখা গেলে ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন নগরী থেকে মাইল তিনেকের কম দূরত্বে অবস্থিত 'দি হ্যান্ড অব গড' নামক একটা গোরু মহিষের খামারে মৃতদেহগুলি সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়, পরে এর নামকরণ করা হয় 'সর্বজনীন সমাধিক্ষেত্র'।

মার্কোজের 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা'তে মহামারী আছে ঠিকই কিন্তু তাকে একপাশে রেখে জুভেনাল উরবিনো, ফারমিনা ডাজা আর ফ্লোরেন্টিনো আরিজার প্রেম, প্রত্যাখ্যান, দাম্পত্য, রাগ-অনুরাগ, সর্বোপরি জীবন আর ভালোবাসার কথা। তাই জুভেনাল উরবিনোর মৃত্যুর পর ফারমিনা ডাজা পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য শেষে আবার তারই প্রত্যাখ্যাত অথচ নিবেদিত প্রেমিক ফ্লোরেন্টিনো আরিজাকে ঘিরে জীবনের স্বপ্ন দেখে। তীরভূমি জুড়ে কলেরা আক্রান্ত মানুষ। আর ফ্লোরেন্টিনো সেই তীরভূমি এড়িয়ে নিজের নৌযানে ফারমিনা ডাজাকে নিয়ে, জাহাজে কলেরা আক্রান্ত মানুষ রয়েছে এই মিথ্যা ধারণা তৈরি করতে হলুদ পতাকা তুলে ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ার যাত্রা শুরু আর যাত্রা শেষের স্থান দুটির মাঝে গতিময় নদীবক্ষে। এ যেন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনের অনন্ত গতিধারারই ইঙ্গিত! মার্কোজ শেষ করেছেন যেভাবে, সেভাবেই শেষ করি –

"কাপ্তান ফারমিনা ডাজার দিকে তাকালো, সে ওর চোখের পাতায় লক্ষ্য করল শীতের তুষারের প্রথম ঝিলিক। তারপর সে তাকালো ফ্লোরেন্টিনো আরিজার দিকে, তার অপরাজেয় শক্তির দিকে, তার নিঃশঙ্ক প্রেমের দিকে এবং বিলম্বে উপলব্ধ একটি সন্দেহ দ্বারা সে অভিভূত হলো, মৃত্যুর চাইতে বেশি জীবনেরই কোনও সীমা-পরিসীমা নেই।

সে ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কতকাল এই নিষিদ্ধ যাওয়া-আসা করবো?'

ফ্লোরেন্টিনো আরিজা তিপান্ন বছর, সাত মাস এগারোটি দিবস-রজনী তার উত্তর নিয়ে তৈরি ছিল।

সে বলল, 'অনন্তকাল।'

অপরিকল্পিত নগরায়ন, সংক্রমণের আঁতুড় ঘর

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে করোনা ভাইরাসের থাবায় অতিমারীর আক্রমণে তছনছ পৃথিবীর সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি। ইতিমধ্যে ২৩২টি দেশে আক্রান্ত ৪৫ লক্ষ মানুষ আর মৃতের সংখ্যা এই মুহূর্তে তিন লক্ষের ওপর। এই অতিমারীর বহু আগে থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংক্রমিত রোগের অন্যতম প্রধান বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে নগরায়নকেই। কোনও সন্দেহ নেই আধুনিক জীবনের মাপকাঠিতে উন্নত আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ, বিনোদন, পরিষেবা, পরিবেশের আকর্ষণই মুখ্য হয়ে উঠছে গ্রাম থেকে শহরকেন্দ্রিক

জীবনযাত্রায়। ফলে পৃথিবীজুড়েই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে অনিবার্য হয়ে উঠছে নগরায়ন। একদিকে যেমন নগর জীবন হয়ে উঠছে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্তানা, ঠিক তেমনই নগরায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্কের বোঝাপড়ার অভাব দিনে দিনে নতুন নতুন বিপদের ডালি মেলে ধরেছে। জনস্বাস্থ্যের সাথে জনশিক্ষার, দূষণের সাথে নির্মাণ, জনঘনত্বের সাথে যান ঘনত্ব, সংক্রমণের সাথে পরিবেশ, এমন বহু মৌলিক বিষয়গুলির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ সম্পর্কে যথেষ্ট জানা বোঝার অভাবেই এখন ছুটে চলা নগরায়নের গতিতে অশনিসংকেত দেখছে মানুষ। বাজারের তত্ত্ব মেনেই শহর বাড়ছে পরিবেশের তোয়াক্কা না করেই। ফলে পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়নের বদলে ঘটছে বাজার ধর্মী নগরায়ন কেবলমাত্র আশু লাভ ক্ষতির তাগিদে। ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে নগরায়নের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ভাবনা। বিশ্বায়নের যুগে ঘটে চলা দ্রুত নগরায়ন শেষমেশ বিকৃতির কবলে পড়ে হয়ে উঠছে সংক্রমণের আঁতুড় ঘর।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু তুলনীয় ছিল আজকের এই অতিমারীর মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির। ১৯১৮-২০ এই সময়কালে ঐ ফ্লুতে-এই পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন আর মারা গিয়েছিলেন ৫ কোটি মানুষ যাঁদের বেশির ভাগটাই ছিল শহরাঞ্চলের। স্প্যানিশ ফ্লু-র সময়ে পৃথিবীজুড়ে শহরে থাকা মানুষের পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ২০%, যেটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫%। স্প্যানিশ ফ্লু-র শতবর্ষ পরে এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সিংহভাগই হলো নাগরায়িত দেশের নগরে শহরের, যেখানে যেখানে গত কয়েক দশক ধরেই দ্রুত বেড়ে চলেছে জন ঘনত্ব বাজার অর্থনীতির হাত ধরে। (সারণি-১)।

সারণি-১ : একনজরে পৃথিবীর নগরায়ন চিত্র

দেশ/ মহাদেশ	শহরে থাকা মানুষের সংখ্যা (%)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮২.৩
ইউরোপ	৭৪.৫
আফ্রিকা	৪২.৫
চীন	৫৯.২
ভারতবর্ষ	৩৪.০
গোটা বিশ্ব	৫৫.৩

পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল উভয় গোত্রের দেশগুলিতেই নগরায়নের গতি বৃদ্ধি ঘটছে গত কয়েক দশক ধরেই। পৃথিবীজুড়ে এই নগরায়ন বৃদ্ধির হার এই মুহূর্তে ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় অনেকটাই বেশি এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এশিয়ায় ৮.৮ লাখ এবং আফ্রিকায় ২.৩ লাখ মানুষ নগর জীবনে পা ফেলছে এই দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়েই। আর একই সাথে এই দ্রুত বেড়ে চলা পৃথিবীতে প্রতিদিন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ৫০০০০ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। এই অতিমারীর সময়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন সংবাদ শিরোনামে থেকেছে। কারণ চীনের উহান শহর থেকেই এই ভাইরাসের সংক্রমণের সূত্রপাত। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের তুলনায় নগরায়নের বৃদ্ধির হার এদেশে যথেষ্ট কম। ১৯৭৫ সালে চীনের ১৭.৪% মানুষ থাকতেন শহরে যেটা গত চার দশকে বেড়ে হয়েছে ৫৯.২%। অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঐ একই সময়কালে শহরে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে মাত্র ৩৪%। বর্ধিত নগরায়নের গতিতে চীনের অর্থনীতি হয়ে উঠেছে এখন অনেক বেশি শিল্প ও পরিষেবা কেন্দ্রিক। পৃথিবীর শিল্প মানচিত্রে সর্বোচ্চ স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে তারা পরিকল্পিত নগরায়নের পথ ধরেই। কিন্তু নগরায়নের এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে পৃথিবীজুড়েই আর্থিক বিভাজনের ভেদ রেখা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়নে। সেখানে ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহরের মধ্যেকার বিভাজন রেখাগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

নগরায়নে গতি: সংক্রমণ

নগর জীবনে গতি হলো নগরায়নের একটা বড় সূচক। কিন্তু সংক্রমণের বিপদের সাথেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছে নগর জীবনের গতি। ‘ফাস্ট ফুড’ থেকে শুরু করে ‘ফাস্ট ড্রাইভ’, ‘ফাস্ট রক’ থেকে ‘ফাস্ট মুভি’। অবস্থা এমনই যে গতি মোহের কবলে পড়ে টেস্ট ক্রিকেট বিদায় নিয়ে খেলার মাঠেও টি-২০ বাসা বেঁধেছে। শহরের মানুষের জীবনে বাজার হাট, রেস্তরাঁ, শপিং মল, মেট্রো রেল, লোকাল ট্রেন এসব হলো যোগাযোগের সূত্র আর মাধ্যম। শহর জীবনের দ্রুত গতির কারণে একই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান কাল পাত্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। করোনার মতো ভাইরাসের সংক্রমণ তার ধারক আর বাহকের গতির ওপরেই

অনেকটা নির্ভরশীল। এই ভাইরাসের একটা পর্যায়ে ধারক আর বাহক জীবিত মানুষজনই। চীনের উহান শহর যেখান থেকে এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রথম ঘটনা নজরে আসে সেটা কলকাতার মতোই চীনের এক মস্ত বড় শহর, যে শহরটি বিমান যোগে পৃথিবীর ৩৪টি গন্তব্যের সাথে যুক্ত। ফলে এই শহর থেকে ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে, বিমানের জেট গতিতে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের যে কোনও প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে সংক্রমণের বাহক হিসাবে। গত কয়েক দশকে নগরায়নে বাড়তি গতি এনেছে এই বিমান পরিবহণ। সত্তরের দশকের শুরুতে পৃথিবীজুড়ে বছরে যখন ৩১ কোটি মানুষ বিমানযাত্রা করতো, সেই সংখ্যা ২০১৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪২০ কোটি। ফলে ভাইরাস সংক্রমণের বিপদ এত দ্রুত চীন থেকে ইতালি, বা স্পেন থেকে ব্রিটেন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে রয়েছে নগরায়নের এই বাড়তি গতি ও সংযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা।

এদেশের শহর জীবনে মেট্রো রেল, লোকাল ট্রেন বা বাস মিনিবাস অটো রিকশা গণপরিবহণের মূল অংশ। এদেশে যাত্রী পরিবহণে ৮৫% ভার বহন করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু শহরের বিপুল জন ঘনত্বের তৈরি হওয়া যান ঘনত্ব শহরের গতিমন্দার একটা বড় কারণ। বিমানের জেট গতি যেমন দ্রুত সংক্রমণের প্রসার ঘটায় ঠিক তেমনই শহরের শ্লথ গতিও সংক্রমণের একটা বড় কারণ। দেশের মোট রাস্তার মাত্র ৯% শহরাঞ্চলে। কিন্তু সেই ৯% রাস্তার ওপর দিয়ে যদি দেশের ৩১% যানবাহন চলাচল করে তখন বোঝা সহজ হয়ে যায় শহরের সকাল সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে রাস্তায় গতিমন্দার কারণ। সকাল সন্ধ্যায় ব্যস্ত সময়ে দেশের ধীর গতির শহরে কলকাতায় যেখানে যানের গড় গতি ঘণ্টায় ১০-১২ কিলোমিটার সেখানে দেশের দ্রুতগতির মেগাসিটি দিল্লিতে ঐ গতিবেগ ঘণ্টায় ২০-২২ কিলোমিটার। বলাই বাহুল্য অপরিকল্পিত নগরায়নে তৈরি হওয়া জন ঘনত্বের মানানসই গণপরিবহণে যানবাহনের অভাবের কারণেই শহরের যানবাহনে যাত্রী ঘনত্ব তুলনায় অনেক বেশি। ফলে সকাল সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যেভাবে ট্রেনে বাসে মানুষ যাতায়াত করতে বাধ্য হন, তাতে স্পর্শবাহী সংক্রমণের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। পাশাপাশি ধীর গতির কারণে ভিড় অবস্থায় অনেক বেশি সময় ধরে যানবাহনের মধ্যে মানুষে মানুষে দৈহিক সংস্পর্শে বাড়তে থাকে সংক্রমণের

বিপদ উত্তরোত্তর। মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লির মতো লোকাল ট্রেনে নিত্যযাত্রী সংখ্যা প্রতিদিন যথাক্রমে ৭০ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ এবং ২৫ লক্ষ। এই বিপুল পরিমাণ মানুষ লোকাল ট্রেনে যে ঘনত্ব বজায় রেখে নিত্যদিন যাতায়াত করে তাতেও যেকোনও মুহূর্তে সংক্রমণের বিপদ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এখানে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া দরকার যে লোকাল ট্রেনের এই বিরাট সংখ্যক মানুষ মূল শহরের সাথে লাগোয়া শহরতলি এমনকী গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। কাজের প্রয়োজনে সকালে শহরে এসে সন্ধ্যায় তারা বাড়ি ফিরে যায়। ফলে লোকাল ট্রেনের ভিড়ে তৈরি সংক্রমণের এই শহুরে বিপদ ট্রেনের ভিড় ধরেই শহর থেকে শহরতলি অথবা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর পাশাপাশি নগরায়ন ভাবনায় মোটরচালিত যানের বাইরে বেরিয়ে বাইসাইকেল বা হেঁটে চলার মতো কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা আজও এদেশে কোনও বড় শহরে বাস্তবায়িত করা যায়নি মূলত পরিকল্পনার ও অগ্রাধিকার বোঝার অভাবে। সংক্রমণের এমন সময়ে চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো, নিউইয়র্কের মতো দামি শহরেও যেখানে গণপরিবহণ এড়িয়ে সাইকেল চড়ার ধুম পড়ে গেছে, সেখানে আমাদের মতো গরিব দেশে লাখ লাখ মানুষের সাইকেল থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ পথের অভাবে এই নিরাপদ যান ব্যবহার করা যাচ্ছে না। একই যুক্তিতে মানুষের পায়ে হেঁটে শহরের ছোট দূরত্ব অতিক্রম করার নিরাপদ পথ পাওয়া দুর্লভ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গড়ে এদেশের শহরের মানুষের দৈনিক যাতায়াতের প্রয়োজন ১০-১২ কিলোমিটার, যেটা পরিকল্পিত উপায়ে সাইকেলে চালু করতে পারলে সুলভে খানিক দূষণমুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায় সংক্রমণের বিপদ এড়িয়েই।

নগরায়ন-সংক্রমণ-জনঘনত্ব

সরকারি ভাষ্যে প্রচারিত যে সংক্রমিত বা সংক্রমণের উপসর্গ থাকা মানুষজনের ঘরবন্দি জীবন কিছুদিন কাটানো জরুরি তার পরিবার বা সমাজের স্বার্থেই। কিন্তু শহুরে পরিবারের ঘরের হাল হকিকৎ কেমন যে মহামারীর পরিস্থিতিতে এক বাড়িতে কয়েকজন গৃহবন্দি জীবন কাটাতে পারে? এদেশের ৬৯তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশিত দেশের শহরে ৬০% মানুষের গড়ে মাথাপিছু বাসস্থানের মাপ ৯৩ স্কোয়ার ফিট, যা এদেশের জেল বন্দিদের প্রাপ্য মাথাপিছু ৯৬ স্কোয়ার ফিটের তুলনায় কম।

মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তিতে ছড়ানো হচ্ছে কীটনাশক

পরিবারের রান্নাঘর শৌচাগার বারান্দা এসব ধরলে শোবার ঘরের মাথাপিছু স্থান ৭২ স্কোয়ার ফিট। আর ভাড়ার বাড়ি বা বস্তিতে বাস করা শহরের মানুষজনের জন্য বরাদ্দ এই বাসস্থান মাত্র ৪৮ স্কোয়ার ফিট। এদেশের সর্বশেষ জনগণনার তথ্যে প্রকাশিত যে দেশের শহরাঞ্চলে ৩৫% মানুষ আর গ্রামে ৪৫% মানুষ তাঁদের বাড়ির একটা ঘরে পরিবারের তিন বা তার চেয়েও বেশি মানুষ নিয়ে বাস করেন। রাজ্যভিত্তিক এমন পরিবারের সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে যে উত্তর প্রদেশের ৭১টি জেলার মধ্যে ৫৫টি জেলা, মহারাষ্ট্রের ৩১টি জেলার ১৯টিতেই বাসস্থানের এমন ভয়াবহ চিত্র। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গ্রামীণ ৪০% পরিবারের বাসস্থানের এমনই করুণ হাল। ফলে শুধু মাথাপিছু গড় বাসস্থানের এলাকা দিয়ে নয়, বরং বাসস্থানে জনঘনত্বের তথ্য হাল আমলের ছোঁয়া লাগা সংক্রমণের বিপদকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি এই অতিমারী সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশের একমাত্র সফল রাজ্য কেরলে এই রকম এক ঘরে তিন বা তার বেশি মানুষের বাসের সংখ্যাটা গড়ে ১৫%-এর বেশি নয়। শহরের মানুষের এই বিষম বাসস্থানের চেহারা দেখে চোখ বুঝে বলা যায় গরিব মানুষ আক্রান্ত হলে আর যাই হোক, সংক্রমণ রোধে হোম আইসোলেশনের বা গৃহবন্দি থেকে আক্রান্তের গৃহে পর্যবেক্ষণের কোনও সুযোগ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আপাত লক্ষণহীন অথচ সংক্রমিত মানুষেরা তাঁদের অজান্তেই তাঁদের পরিবারের,

তাঁদের প্রতিবেশীদের দ্রুত সংক্রমণ ঘটিয়ে চলেছে এই বাসস্থানের অভাবজনিত কারণেই।

পরিকল্পনার অভাবে এদেশের মেগাসিটিগুলোর জনঘনত্ব ভয়াবহ রকমভাবেই বেশি যেটা সারণি-২-তে উল্লিখিত রয়েছে। জনঘনত্বের নিরিখে মুম্বাই পৃথিবীর প্রথম আর যান ঘনত্বের কারণে দূষণের নিরিখে দিল্লি পৃথিবীর প্রথম শহর হিসাবে ইতিমধ্যে স্বীকৃত। জনঘনত্বের পাশাপাশি শহরজুড়ে জনবন্টনের চেহারাটাও বিবেচনায় রাখতে হবে সংক্রমণের বিপদকে বোঝার ক্ষেত্রে। কলকাতা বা মুম্বাইয়ের মতো মেগাসিটিতে এখন ভয়াবহ জনঘনত্বের চেহারা যা প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে যথাক্রমে ২৪০০০ এবং ৩০০০০ জন। পাশাপাশি এই দুই শহরের যথাক্রমে ৩২% ও ৪২% মানুষ থাকেন শহরের বস্তি অঞ্চলে। মুম্বাই শহরের মধ্যে বস্তিতে মাথাপিছু বাসস্থানের পরিমাণ ২৯.৪ স্কোয়ার ফিট। আর সেই শহরে এশিয়ার বৃহত্তর বস্তি ধারাভিতে জনঘনত্বের পরিমাণ প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে ২০০০০০ মানুষ। এর অর্থ দাঁড়ায় মুম্বাই শহরের গড় জনঘনত্বের চেয়ে ছয় গুণ বেশি জনঘনত্ব সেই বস্তি এলাকায় যেখানকার মানুষ আয়ের নিরিখে নিম্ন স্তরে। ফলে স্পর্শজনিত অথবা বায়ু বাহিত সংক্রমণের বিপদ যে এমন জনবহুল গরিব মানুষের এলাকায় অনেক বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। শুধু বস্তি অঞ্চল নয়, বস্তি ছাড়াও শহরের ঘিঞ্জি বাড়ির ঘনত্ব সেই এলাকার বাড়িগুলিতে বায়ু চলাচলের স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে তোলে যেটি সংক্রমণ প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরের এক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী এই শহরের উপকণ্ঠে আধা আইনি, বেআইনীভাবে প্রচুর গরিব মানুষ ছোট ছোট কুঠুরিতে, গ্যারাজে, বেসমেন্টে, গুদামে ভাড়া থাকেন, যেটা আমাদের দেশের ভাষায় বস্তি হিসেবেই চিহ্নিত। ফলে সেদেশে ঐ শহরে সর্বোচ্চ জনঘনত্ব (২৭০০০ মানুষ প্রতি এক স্কোয়ার মাইলে) তৈরি হয়েছে এই গরিব মানুষদের উপস্থিতিতে, যাঁরা প্রান্তিক আয়ের এবং নিকৃষ্টমানের বাসস্থানে জীবন কাটান। আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহর করোনার এপি সেন্টার হয়ে ওঠার এটাও অন্যতম বড় কারণ। আর এ ভাবেই দরিদ্র আর অপুষ্টির বলি হতে হয়েছে পৃথিবীর এক নম্বর দেশের এক নম্বর শহরের দরিদ্রতম মানুষদের এই অতিমারীর সঙ্কটে।

সারণি-২ দেশের শহর ভিত্তিক জনঘনত্বের চিত্র

শহরের নাম	জনসংখ্যা/স্কোয়ার মাইলে
হায়দরাবাদ	২৩৫৪৫
বেঙ্গালরু	২৬১৯১
নয়াদিল্লি	২৮৬০০
চেন্নাই	৩৭২২৩
কলকাতা	৬১৯৪৫
মুম্বাই	২৬৭৯০

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রচারিত হচ্ছে – বাড়ির বাইরে গেলেও খেয়াল রাখতে হবে যে পাশের মানুষটির সাথে আপনার দূরত্ব বাঁয়ে ডায়ে নিদেনপক্ষে এক মিটার থাকে যার অর্থ মাথাপিছু চার স্কোয়ার মিটার খালি জায়গা প্রয়োজন অথচ কলকাতার মতো শহরে তেমন জায়গা মাথাপিছু গড়ে ২.৭ স্কোয়ার মিটার। ফলে আপনি চাইলেও পথেঘাটে অন্যের ছোঁয়া এড়িয়ে চলা দুঃসাধ্য। সংক্রমণ ঠেকাতে হ্যান্ড সানিটাইজার-এর পাশাপাশি ঘন ঘন হাত ধোয়ার সু-অভ্যাস সুনিশ্চিত করতে শহুরে কোটি কোটি মানুষের জন্য যে পরিমাণ পরিশোধিত জলের জোগান প্রয়োজন তা এদেশের কোনও মেগাসিটিতেই নেই। মুম্বাই, দিল্লি, আমেদাবাদ, হাদয়রাবাদ, কলকাতা বা চেন্নাই এর মতো বড় শহরে দিনে আট ঘণ্টা বিশুদ্ধ জলের জোগান আজ অনিশ্চিত। করোনা সংক্রমণ রোধে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত পা ধোয়ার নিদান যে এদেশের গরিব শহুরে মানুষের জীবনের বড় রসিকতার উপাদান তা ঠেকে শেখা মানুষ মাত্রেই জানে। দেশের মেট্রো শহরগুলোর বস্তিতে পানীয় জলের কলের সংখ্যা যত হলে দৈহিক দূরত্ব মেনে কলের জল আসার সময়ে লাইন দিয়ে মানুষ প্রয়োজনের জল ধরে রাখতে পারে? এমন তথ্য না আছে সরকারের কাছে আর না রয়েছে তেমন জল কলের অস্তিত্ব। এর সাথে যদি সেসব অঞ্চলে কমিউনিটি স্নানাগারের ও শৌচাগারের ভয়াবহ চিত্র যোগ করা যায় তাহলে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যাবে জলবাহিত এবং বায়ুবাহিত সংক্রমণের

 কার্য-কারণ সম্পর্ক।

নগর জীবনের সমাজ বিচ্ছিন্নতা-সংক্রমণ

যে দেশে কোটি কোটি মানুষকে শৌচাগারে পাঠাতে স্বাধীনতার পরে সত্তর বছর লেগে যায় – তেমন জনস্বাস্থ্যের চেতনায় বলীয়ান দেশে করোনার মতো মহামারী বিপর্যয়ের বিপদ সঙ্গত কারণেই ইউরোপ বা অন্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। জনস্বাস্থ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জনশিক্ষার প্রসার, যেখানে আমাদের অবস্থা হাঁড়ির হাল। এমন অবস্থায় করোনা আক্রমণের প্রেক্ষিতে জন সচেতনতা গড়ে তোলাটা সরকারি প্রয়াসের অন্যতম জরুরি পদক্ষেপ। সন্দেহ নেই এই ভাইরাসের প্রাথমিক ধারক বাহক ছিল মূলত ভিন দেশ থেকে আসা মানুষজন। পুঁথিগত শিক্ষায় এদের দেশের বা বিদেশের অগ্রণী নাগরিক হিসাবে ধরা যায়। করোনার প্রাথমিক সংক্রমণ রুখতে এমন মানুষদের দেশে ফেরার পর স্বগৃহে কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকতে বলা হয়েছিল। সমাজে ব্যাপক হারে সংক্রমণের পথকে অবরুদ্ধ করার স্বার্থেই। কারণ এ ছাড়া ঐ ভাইরাসের সাথে লড়াইয়ের বিজ্ঞানসম্মত কোনও পথ এখনও আবিষ্কৃত নয়। এমন অবস্থায় তথাকথিত ঐ শিক্ষিত মানুষজনের রোগ সংক্রমণ বিধি ভঙ্গের উদাহরণ এক অর্থে বিস্ময়ের আর দুঃখেরও। নায়ক নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে চিকিৎসক আমলা কেউ বাদ যায়নি সে তালিকায়। আমি বাঁচি আমার জন্যই – পশ্চিমের নিউক্লিয়াস সমাজের এমন ভাইরাসে আক্রান্ত এ প্রজন্মের তরুণ থেকে বয়স্ক সকলেই, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছে নগরায়নে নতুন এই মডেলে। ফলে মহামারীর এই সম্ভাব্য বিপদের মধ্যে তাদের ওই আইন ভাঙার দুঃসাহস – কেয়ার করি না, মনোভাবের প্রভাবের প্রতিফলন মূলত অর্থ আর ক্ষমতার অলিন্দে যোগাযোগের কারণেই। উন্নত চিকিৎসার ঘেরাটোপে আমার পরিবার আছে এমন নিশ্চিন্তার মাদুলি গলায় ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে

> *বিকৃত নগরায়নের ধাক্কায় শহরে যেমন দ্রুত জনঘনত্ব বেড়ে চলেছে তেমনই নাগরিক সমাজের মধ্যেকার সামাজিক বাঁধন আলগা হচ্ছে*

একদল মানুষ মল থেকে রেস্তোরাঁয়। আর কমিউনিটি লাইফ বা গোষ্ঠী জীবনের বিপদ ডেকে আনছে এরাই আত্মঘাতী ঢঙে। বৃহত্তর সমাজ জীবনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজে বিপদে পড়া আর অন্যকে বিপদে ফেলার কারিগর এই সমাজ বিচ্ছিন্নতার বলি মানুষজন। সমাজ বিচ্ছিন্নতা এতোটাই সঙ্গিন যে পাশের ফ্ল্যাটের বয়স্ক মানুষটির মৃতদেহ থেকে পচা দুর্গন্ধ না বেরোনো পর্যন্ত প্রতিবেশীর খোঁজ পায় না শহর। বিচ্ছিন্নতা এতোটাই যে 'blue whale' গেমের খপ্পড়ে পড়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে সমাজ বিচ্ছিন্ন পড়ুয়ার দল। শহুরের কাজের ধরণ, কাজের চাপ, কাজের সময়, আর ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শহরে ভিড় জমানো মধ্য বয়সিদের ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দিচ্ছে একে অন্যের থেকে। ফলে একটা দুর্গাপূজার চারটে দিন বা হোলির একদিনের, কমিউনিটি লাইফ, দিয়ে কমিউনিটিবোধ তৈরি হচ্ছে না। অথচ এই শহর লাগোয়া উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে এই কমিউনিটি লাইফ ছিল একটা দৃষ্টান্ত। পুব বাংলা ছেড়ে এদেশে নতুন করে ভিটে মাটি জোগাড়ের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপরই তৈরি হয়েছিল ঐ কমিউনিটিবোধ জীবন সংগ্রামের কঠিন অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে। এমনকি এখনও শহরের বস্তিবাসী মানুষের মধ্যে এমন গোষ্ঠীবদ্ধতা তুলনায় অনেক ভালো তথাকথিত ফ্ল্যাটবাড়ির আবাসনের চেয়ে। বলাই বাহুল্য আধুনিক ভোগবাদী জীবন শৈলীতে নগরজীবনে জীবনবোধ চাচা আপন প্রাণ বাঁচার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ফলে নগরজীবনে দ্রুত নাগরিকদের প্রবেশ ও প্রস্থান ওই শহরের মানুষজনের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষিতে শহরের পরিমণ্ডলে ঘাঁটি গাড়া ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ আর কোনোভাবেই ফ্ল্যাটের গন্ডি আবাসনের পাঁচিল বা পাড়ার সীমানায় আটকানো যাচ্ছে না। ফলে বিশ্বায়িত লড়াইয়ে শহর জীবনে সমাজ বিছিন্ন মানুষকে নিয়ে করোনা থেকে ডেঙ্গু জাতীয় মহামারী বিপর্যয় মোকাবিলা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে। বিকৃত নগরায়নের ধাক্কায় শহরে যেমন দ্রুত জনঘনত্ব বেড়ে চলেছে তেমনই নাগরিক সমাজের মধ্যেকার সামাজিক বাঁধন আলগা হচ্ছে। শহরে বসত করা মানুষের সংখ্যা বাড়লেও শহরে বসতি গড়ে উঠছে না।

নগরায়ন-সংক্রমণ-পরিযায়ী শ্রমিক

সন্দেহ নেই যে নগরায়নের একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে এর অর্থনৈতিক শক্তি। এখন দেশের প্রায় ৬৩% জিডিপি তৈরি হয় শহরাঞ্চল থেকেই সেটি আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের

অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের ৭৫% হবে বলে অনুমান। যদিও দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করে কিন্তু জীবিকা হিসাবে কৃষি নির্ভরতা গত কয়েক দশক ধরেই ক্রমাগত কমে চলেছে। পাশাপাশি বেড়েছে শিল্প ও পরিষেবা কেন্দ্রিক জীবিকার বিকল্প পথ। এই মুহূর্তে দেশের মানুষের আয়ের আনুপাতিক চিত্রটা হলো কৃষি শিল্প পরিষেবা ১:৩:৪। অর্থাৎ কৃষির তুলনায় শিল্পে যুক্ত মানুষের আয় ৩ গুণ আর পরিষেবা ক্ষেত্রে ৪ গুণ বেশি। ফলে একদা কৃষি নির্ভর এই দেশে গোটা শ্রম সম্পদের মাত্র ৪২.৭% এখন কৃষিকাজে যুক্ত থেকে দেশের জিডিপি'র মাত্র ১৭.৩% তৈরি করছে। যেখানে দেশের ২৩.৮% শ্রম সম্পদ শিল্পক্ষেত্রে আর ৩৩.৫% পরিষেবা ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে দেশের বাকি জিডিপি নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে পুরানো কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন শিল্প ও পরিষেবামুখী হচ্ছে, তখন তাঁদের নতুন কর্মক্ষেত্র হিসাবে উঠে আসছে শহরাঞ্চল। ধারাবাহিকভাবে ভ্রান্ত দেশের কেন্দ্রীয় নীতির কারণে একদিকে চাষ যখন অলাভজনক ক্ষেত্র হয়ে উঠছে, তখন নগরকেন্দ্রিক শিল্প ও পরিষেবার কাজে গ্রাম নতুন প্রজন্মের মানুষেরা দলে দলে শহরমুখী হচ্ছেন। আর এই শহরমুখী হওয়া মানুষজন বিকল্প পেশায় যুক্ত হচ্ছে নগরায়নের নতুন শ্রমের যোগানদার হিসেবে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে শুধু দক্ষ চাকুরের দল নয় এমনকি অদক্ষ, অর্ধ দক্ষ মানুষেরাও দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যোগ দিচ্ছেন। এমন পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগই যোগ দিচ্ছে নগরায়নের বৃহত্তম কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্মাণ শিল্প (৩৬.২%) এবং ছোট মাঝারি উৎপাদন ক্ষেত্রে (১৫.৩%)। এছাড়াও এরা ভিন রাজ্যে কৃষি উৎপাদনে কৃষি শ্রমিকের ভূমিকা পালন করে (২০.৮%)। সাম্প্রতিক অতীতে করা দিল্লি কেন্দ্রিক এক সমীক্ষায় প্রকাশিত যে নির্মাণ ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিযায়ী শ্রমিক হলো পশ্চিমবঙ্গ (৩৩.৩%) আর প্রতিবেশী রাজ্য বিহার (৩১.৩%) থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই হার সর্বাধিক হওয়ার অন্যতম কারণ এ রাজ্যের নির্মাণ শ্রমিকদের ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত শ্রম দক্ষতার পাশাপাশি কৃষিতে বন্ধ্যাত্ব। বামফ্রন্ট আমলের ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিতে যে বিপুল উন্নয়নের সূচনা হয়েছিল সেটিকে আরও সংহত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল শিল্পায়নের যা রাজনৈতিক কারণেই বিরোধীরা বানচাল করে দিয়েছিল। আর সেই থেকে রাজ্যে বিশিল্পায়নের মাশুল গুনছে শিক্ষিত ছাত্র যুব থেকে

কৃষক শ্রমিক সবাই। পরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের অভাবে রাজ্য থেকে দলে দলে মানুষ পরিযায়ী হয়ে পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে।

গোটা দেশে এমন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দশ কোটির কাছাকাছি যারা দেশের নগরায়ন প্রক্রিয়ায় সুলভ শ্রমের ভাঁড়ার। এদের সিংহভাগই নির্মাণকারী সংস্থার দ্বারা সরাসরি নিযুক্ত হয় না, এদের নিয়োগ করে স্থানীয় ঠিকাদার সংস্থা। এই ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করে এই পরিযায়ী শ্রমিকের দল যাঁদের স্বাস্থ্য ও শ্রম সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে দিনভর ক্রীতদাসের মতো খাটিয়ে তোলা হয়। আর মূল নির্মাণকারী সংস্থার অধীনে কর্মরত না হওয়ায় আইনের ফাঁক গলে এদের রুটি, রুজি, জীবন, মৃত্যু সবেরই দায়মুক্ত হয়ে নির্বিকার থাকে নির্মাণকারী সংস্থা। মালিক আর ঠিকাদারের লাভক্ষতির অঙ্ক মিলিয়েই এই শ্রমিকদের রাখা হয় নির্মাণ বা উৎপাদন ক্ষেত্রের কাছাকাছি শ্রমিক ছাউনিতে, যেগুলি সাধারণ স্বাস্থ্য বিধির নিরিখে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের। শহরের বস্তি অঞ্চলের স্থায়ী কাঠামোর কারণে যেটুকু পৌর সুবিধার ছিটেফোঁটা বস্তিবাসীদের কপালে জোটে, এই পরিযায়ী শ্রমিকদের কপালে সেটুকুও জোটে না এই শ্রমিক ছাউনির অস্থায়ী চরিত্রের জন্য। কারণ একটার পর একটা নির্মাণ শেষে নির্মাণ ক্ষেত্র ছেড়ে বয়ে চলে ঐ পরিযায়ী মানুষের স্রোত। ফলে এই অতিমারীর বাজারে যে কারণে শহরের বস্তিতে সংক্রমণ দ্রুত প্রসারিত হয় তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ পরিস্থিতি হয় এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে। এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা এ দেশের অর্থনীতিতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই উপেক্ষিত দেশের রাজনীতিতে। এই নির্মম সত্যটা গোটা দেশ দেখছে দিনের পর দিন এই লকডাউনের বাজারে। এই পরিযায়ী মানুষের পরভূমে ব্রাত্য সে রাজ্যের সরকার গড়ার ভোটে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মর্যাদা ভোগ করে তাঁরা। কারণ তাঁর আধার কার্ড থেকে ভোটার কার্ড সবই থাকে তার স্বভূমির ঠিকানায়। কিন্তু তার দীর্ঘ ও দৈনন্দিন অনুপস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া রাজা প্রজার আনুগত্যের সমীকরণে স্বভূমেও সেই পরিযায়ী শ্রমিকবাহিনী উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে 'না ঘরকা না ঘাট কা' এমন হাল হয়েই দিন কাটে এদের।

সন্দেহ নেই একশো তিরিশ কোটির দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকাতে মানুষকে গৃহবন্দি রাখাই ছিল লকডাউনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব আর জনবহুল দেশে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সরকারি প্রস্তুতি ছিল অপর্যাপ্ত। কারণ লকডাউনে মানুষকে গৃহবন্দি

রাখাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রে প্রথম ভাবা উচিত ছিল গৃহহীন মানুষেরা যাবে কোথায়? এখানে গৃহহীন অর্থে ভবঘুরে নয় বরং এতদিন যারা কোনও না কোনও গৃহে স্থান পেয়েছিল তারা যদি লকডাউনের কারণে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয় সেখানে দেশের সরকারের ভূমিকা ঠিক কি হবে? কারণ এই প্রেক্ষিতেই খুঁজতেই হবে বাস্তুচ্যুত পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের পথ। করোনার মতো মারণ ভাইরাসের অস্তিত্ব এ দেশে জানুয়ারি মাসে ধরা পড়ার পরও অরক্ষিত রইল দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে সম্ভ্রান্ত পরিযায়ী মানুষজনের আনাগোনা, বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে যাঁরা ছিলেন ওই মারণ ভাইরাসের প্রাথমিক ধারক-বাহক। কিন্তু পাক্কা সাত সপ্তাহ সময় হাতে পাওয়ার পরও দেশের সরকার প্রস্তুতিহীন অবস্থায় মাত্র চার ঘণ্টার নোটিসে লকডাউনের ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা মতো দেশের স্কুল, কলেজ থেকে কলকারখানা সব রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল। রাতারাতি এমন বন্ধের আর্থ-সামাজিক প্রভাব যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনে এমন ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে সেটা কি দেশের সরকার আগাম বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে? না কি সব বুঝেও ঝুঁকি নিয়েছিল এই 'না ঘরকা না ঘাট কা' মানুষজনের জীবন যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করার? লকডাউন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিদান দিয়েছিলেন, বাড়ির কাজের মাসি থেকে, দোকানের কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক কারও যেন মজুরি কাটা না হয়। কিন্তু লকডাউন শুরু হওয়ার পর দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা কলকারখানার মালিকেরা দু-এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই নির্বিচারে বন্ধ করেছে শ্রমিক কর্মচারীদের দিন মজুরি, মাস মাইনে। প্রথম কদিন এঁটো কাঁটা জোটার মতো খানিক ত্রাণ জুটলেও দিন যত গড়িয়েছে তাঁদের অবস্থা হয়েছে ততটাই শোচনীয়। সম্প্রতি 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার এক সমীক্ষায় প্রকাশিত, যে

> *সন্দেহ নেই অরক্ষিত অবস্থায় শ্রমিক আস্তানায় জনঘনত্বের কারণেই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংক্রমণের সম্ভাবনা তুলনায় বেশি*

দেশের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ৯৬% লকডাউনের সময় কোনও রেশন পায়নি আর ৯০% শ্রমিকের মজুরি জোটেনি। ফলে পকেটে নেই টাকা, পাতে নেই ভাত। অতএব প্রাণে বাঁচতে পকেটে দু'চারশো টাকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে, সাইকেলে চেপে এরা বাড়ি ফিরতে চেয়েছে যদি নিজের রাজ্যে গিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো রেশনের খাবার জোটে। এরা পেটের দায়ে দিন কাটায় বাড়ির বাইরে আর আজ এই সঙ্কটে তারা পেটের দায়েই আবার ফিরতে চেয়েছে নিজের রাজ্যে। অথচ দেশের সরকার মানুষের রেশনের চেয়ে ভাষণকে বেশি কার্যকরি করে তুলেছে, প্রচারমাধ্যমে ঝড় তুলে। প্রকৃত কার্যকর ব্যবস্থার চেয়ে প্রতীকী প্রশাসনিক পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়েছে লকডাউনের এই দীর্ঘ পর্যায় জুড়েই।

সন্দেহ নেই অরক্ষিত অবস্থায় শ্রমিক আস্তানায় জনঘনত্বের কারণেই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংক্রমণের সম্ভাবনা তুলনায় বেশি। দারিদ্রের সাথে মানুষের সুস্বাস্থ্যের এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। ফলে এমন অরক্ষিত স্বাস্থ্যের দরিদ্র মানুষজনের জন্য যে পরিমাণ পরীক্ষা এবং তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখার দরকার ছিল তার ছিটেফোঁটাও এ দেশে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর গঙ্গার জল বহুদূর গড়ানোর পর এদেরকে সামাজিক সুরক্ষা বিধির তোয়াক্কা না করে যেভাবে গাদাগাদি করে ট্রেনে চাপিয়ে বাড়ি পাঠানো হলো তাতে এই সংক্রমণ বাড়া বই কমার কোন পথ খোলা রহল না। কারণ এটা বোঝা দরকার গ্রামের বাড়িতে ফেরার পর তাঁদের বাড়িতে স্থানাভাবের কারণেই সন্দেহভাজন আক্রান্তের গৃহ পর্যবেক্ষণে থাকার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। উপরন্তু গ্রামীণ চিকিৎসার বেহাল পরিকাঠামো দিয়ে আক্রান্তের চিকিৎসার সুযোগও সীমিত। চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে যেখানে রাজ্যের নিয়মিত বাসিন্দাদেরই হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, সেখানে এই পরিযায়ীদের আগমন অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সরকারের চোখে 'বোঝার ওপর শাকের আঁটির' মতো। ফলে পরিকল্পনার অভাবে সংক্রমণের আর একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হতে পারে এ দেশে এভাবেই শহর থেকে গ্রামে। ফলে একদিকে নগরায়নের বিকাশে এই পরিযায়ীদের প্রয়োজন বেসরকারি পুঁজির আবার বাঁচার তাগিদে এই শ্রমিকদের প্রয়োজন নগর জীবনের ঐ বেসরকারি উদ্যোগকেই। আর এই দেনা পাওনার অসম সমীকরণে পরিযায়ী শ্রমিকেরা হয়ে উঠছে সংক্রমণের

ধারক ও বাহক। The Centre National de la Recherche Scientifique, The Institute Pasteur এবং The National Institute of Malaria Research গবেষণায় প্রমাণিত যে দেশের রাজধানী দিল্লির ৪০% মানুষ জীবনে অন্তত একবার হলেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত এই মানুষের আর্থ-সামাজিক স্তরের খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদের সিংহভাগই হলো শহরের প্রান্তিক ও দরিদ্র আয়ের মানুষ যাদের মধ্যে আবার পরিযায়ী মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক।

নগরায়ন : নিয়ামক সংস্থা নিয়ামক ভাবনা

পৃথিবীজুড়ে নগরায়নের হার দ্রুত লয়ে বাড়লেও শহরের সংজ্ঞা পৃথিবীজুড়ে সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে শহরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিন্তু নগর জীবনে এই সাম্প্রতিক অতিমারির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন নগরায়নের বিকল্প ভাবনার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে হবে। আর ভাবতে হবে পুরানো শহরকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সেগুলির বিকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনা। এ দেশে নগরায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরানো বড় শহরকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট জনপদ দ্রুত শহরাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে কখনও উপনগরীর মডেলে কখনও 'সেন্সাস টাউন' এর ধাঁচে। গত দেড় দশকে এমন 'সেন্সাস টাউন' উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এ দেশে এবং এ রাজ্যেও। সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী এ দেশের মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু আর চেন্নাইয়ের মতো শহরের ৪৮% জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শহরের বাইরের থেকে আসা মানুষজন যাঁদের ৮১% এসেছে দেশের অন্য ছোট শহর থেকে। ফলে নগরায়নের পথে গ্রাম থেকে ছোট শহর, ছোট শহর থেকে বড় শহরে যেমন মানুষ চলেছেন ঠিক তেমনই বড় শহর থেকে একাংশের মানুষ বেরিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন শহরের বাঁচার বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে না পেরে। এই চক্রাকার পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ককে খুঁজতে হবে নগরায়নের সার্বিক প্রভাবকে বোঝার লক্ষ্যে।

অপরিকল্পিত ঢঙে নগরায়নের এই বৃদ্ধি ঘটছে খাল, বিল, পুকুর, জলাজমি, চাষের জমি বুজিয়ে, জঙ্গল কেটে। মরুভূমি ঢেকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ভারসাম্যের শৃঙ্খল ভেঙে গিয়ে যেমন হচ্ছে নতুন নির্মাণ তেমনি বাড়ছে বীজাণু আর জীবাণু সংক্রমণের বিপদ। ইট, কাঠ, কাচ, পাথর, কংক্রিটের জঙ্গলে আটকে শহরে বাড়ছে

উত্তাপের বিপদ। উঁচু বাড়ির দাপটে বিঘ্নিত বায়ু চলাচলের কারণে এই তাপের দ্বীপে পরিণত হচ্ছে শহর। শহরের তাপমাত্রার দ্রুত ঊর্ধ্বগতি সেই শহরের স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে দ্রুতলয়ে আর হয়ে উঠছে সংক্রমণের নতুন বিপদ।

এদেশে শহর পরিচালনার লক্ষ্যে পৌরসভা বা কর্পোরেশনগুলোকে দেশের সংবিধান সংশোধন করে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সরকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ রূপরেখার অভাবে সেই সংস্থাগুলিরও নগরায়নে ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিবর্তনে হস্তক্ষেপের সুযোগ নিতান্তই কম। খানিকটা দিনগত পাপক্ষয়ের মতো কিছু পৌর পরিষেবা দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে সেগুলির কাজের গণ্ডি। সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী এদেশে এমন জনপদ যেখানে ন্যূনতম জনঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ৪০০ জন বা ন্যূনতম জনসংখ্যা ৫০০০ অথবা ৭৫% পুরুষ পেশা হিসেবে অকৃষিকাজের সাথে যুক্ত তেমন অঞ্চলকেই শহরাঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শহরের এই পোশাকি সংজ্ঞায় ন্যূনতম জন ঘনত্ব বা ন্যূনতম জনসংখ্যার কথা উল্লেখ থাকলেও কোন উল্লেখ নেই সর্বোচ্চ জনঘনত্ব বা জনসংখ্যার বিষয়গুলো। ফলে এই সীমাহীন অবস্থা থেকে সীমায়িত ব্যবস্থায় পৌঁছানোর লক্ষ্যেই এখন প্রয়োজন নতুনভাবে চর্চা, নতুনভাবে মূল্যায়ন নতুন আঙ্গিকে। যার মাধ্যমে একটা শহরের বহুবিধ পরিকাঠামোর মানের নিরিখে শহরের ধারণ ক্ষমতা ঠিক করা যায়।

বর্তমানে শহর এলাকায় নির্মাণ ক্ষেত্রের আকার, আকৃতি ও অবস্থানের নিরিখেই অনুমোদন দেওয়া হয় নির্মাণের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতাকে। আর ব্যবসায়িক প্রয়োজনের নিরিখেই সেই নির্মাণের বিভাজন ঘটে বাসস্থান, অফিস, শিক্ষাক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, বাণিজ্য ক্ষেত্র এমন অনেক ভাগেই। আর এই বিভাজন বা শ্রেণি বিন্যাসের উপর দাঁড়িয়েই নির্ধারিত হয় জন ঘনত্বের বিষয়টি। যেমন শপিং মলের জনঘনত্ব আর হাসপাতালের জনঘনত্ব এক হয় না তেমনি বুঝতে হবে শহেরর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী শপিং মলের সংখ্যা আর হাসপাতালের সংখ্যা নির্বাচনের ফর্মুলা। কারণ সংক্রমণ রোখার ক্ষেত্রে শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খুব জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যেখানে প্রতি হাজার মানুষের জন্য একজন ডাক্তার প্রয়োজন সেখানে এদেশে প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য রয়েছে একজন করে ডাক্তার। ফলে বিপুল জনঘনত্বের শহর চিকিৎসা পরিকাঠামোর

সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে শহরের জনসংখ্যার ধারণ ক্ষমতা। যেখানে চীনে, ইতালিতে, আমেরিকায় প্রতি হাজার মানুষে হসপিটাল শয্যার সংখ্যা যথাক্রমে ৪.৩, ৩.২, ২.৮ সেখানে এদেশে প্রতি হাজার মানুষে হসপিটাল শত্যার সংখ্যা মাত্র ০.৫৫। বলাই বাহুল্য এমন বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে ক্রমবর্ধমান জনঘনত্ব শেষমেশ বিপদেরই ইঙ্গিতবাহী। পাশাপাশি শহরের জন ঘনত্বের সাথে রাস্তার আনুপাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি শহরের নিরাপদ গণপরিবহণের স্বার্থে, শহর সচল রাখার স্বার্থে। কলকাতার মতো শহরের মাত্র ৬.৫% রাস্তা দিয়ে যদি সে শহরে দেড় কোটি মানুষ নিত্যদিন যাতায়াত করে তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বায়ু বাহিত সংক্রমণ বা স্পর্শবাহী সংক্রমণে সেই রাজপথ মৃত্যুপুরীর দিকে নিয়ে যাবে মানুষকে। পাশাপাশি ফি বছর দিল্লি কলকাতার দূষণের আলোচনা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত মানুষ ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে বায়ু দূষণ থেকে নির্মাণ দূষণের কবলে পড়ে মানুষের ফুসফুসের দফা রফা হাল। এমন অবস্থায় করোনার সংক্রমণে সেই দুর্বল ফুসফুস আরও দ্রুতলয়ে বেহাল হবে সন্দেহ নেই। ফলে শহর ও শহরতলিতে বাড়ছে এই করোনা সংক্রমণের বিপদ। এর সাথে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব শহরে যেমন বড়িয়ে তুলছে জলবাহিত রোগের প্রকোপ তেমনই অপ্রতুল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে নর্দমার জমা জল হয়ে উঠছে ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর। শহরে বিপুল জনসংখ্যার সাথে বাড়তে থাকা বর্জ্য পদার্থের অপ্রতুল নিষ্কাশনের অভাবে দানা বাঁধছে নতুন নতুন বীজাণু আর জীবাণু সংক্রমণের বিপদ। ফলে এখন সময় এসেছে নগরায়নে নিয়ন্ত্রণের ভাবনা প্রয়োগের। সিঙ্গাপুর, হঙকঙের মতো পৃথিবীর উন্নত বহু শহর বাড়তি জনঘনত্বের চাপ নিয়েও অনেকটাই সংক্রমণ মুক্ত রাখতে পারছে শহরকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পুঁজি আর প্রযুক্তির যে বিপুল বিনিয়োগ সেসব শহরের ঘটাতে হয়েছে সেটা আমাদের মতো গরিব দেশে সম্ভব নয়। উপরন্তু শহরে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি দৃষ্টিতেই শহরের গরিবকে উপেক্ষা এবং বিত্তবানদের চিত্তজয়ের লক্ষ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এদেশের শহরের অগ্রাধিকারের বিষয়বস্তু। যার ফল ভুগতে হচ্ছে এই সংক্রমণের সঙ্কটে। এই প্রেক্ষিতেই সংক্রমণ উত্তর পর্বে খুঁজতে হবে বিকল্প নগরায়নের পথ।

তথ্যসূত্র :

Biswas. P.P (2020) : ‘Skewed urbanization and the contagion’, Economic and Political weekly, Vol-IV No 16, 18th April 2020

Bhaduri. S D (2020): “What India Can Learn from China and South Korea to Ward Off Coronavi-rus.” Economic Times. 19 March, http://eco-nomictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/what-india-can-learn-from-china-and

Desai. D (2020): Urban Density and Pandemic: Upending the Sustainability Myth of global magacity’ Overver Research Foundation paper, May 2020

Economic Times (2019): India Facing Shortage of 600,000 Doctors, 2 Million Nurses: Study,” 14 April, http://economictimes.indiatimes.com/insustry/healthcare/ biotech//healthcare/india-facing-shortage-of-600000- doctors-2-million-nurses-study/articleshow/68875822.cms?from=mdr.

Gol (2011): “Provisional Population Totals: Urban Agglomerations and Cities.” Census of India 2011, government of India. http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/In-dia2/1.%20Data%20 Highlight.pdf”.

Kyle, O, P Sinha, A E Gaughan, F R Stevens and N Kaza (2019): “Missing Millions: Undercounting Urbanization in India, “Population and Envi-ronment, Vol 41, pp 126-50.

Neiderud, Carl-Johan (2015): “How Urbanizations Affects the Epidemiology of Emerging Infec-tious Diseases.”

Journal of Infection, Ecology and Epidomology, Vol 5, No 1, https://www.nebi.nlm.nih.gov//pmc/articles/PMC4481042/pdf/ZIEE_5_11815295.pdf

Stranded workers Action Network’ (SWAN) Report on Migrant Workers, published in “The Hindu 27th April 2020

Telle, O (2018): “Emerging Infectious diseases in India: The Scourge That Could Boost Urban Development,” conversation, 18 April, https://theconversation.com/emerging-infectious-dis-eases-in-india-the-scourge-that-could- boost-urban-development-95076.

Vidal, John (2018): “The 100 Million city: is 21st Century Urbanization Out of Control?” Guardian, 19 March, https://www.theguardi-an.com/cities/2018/mar/19/urban-explosion-kinshasa-el-alto-growth-mexico-city-bangalore-lagos.

Whiting, Kate (2020): “Coronavirus Ist’t an Outlier, It’s Part of Our InterconnectedViral Age,” World Economic Forum, 4 March, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/corona-virus-global-epidemics-health-pandemic-cov-id-19/.

Times Now (2017): “Majority of Indians Reside in Homes Smaller than Prison Cells: Report,” 28 August, https://www.timesnownews.com/business-economy/real-estate/article/majori-ty-of-inidans-reside-in-hom

মজুত বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল ১৬,০০০ থেকে ২০,০০০ মতো ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে আনতে হবে দেশে। কারণ তারা কাজ হারাতে চলেছেন। রিষড়ার বিড়লাদের কাপড় তৈরির কারখানা থেকে তামিলনাড়ুর তিরুপুর, গোটা দেশ এবং দুনিয়ায় বস্ত্র শিল্পে সঙ্কট। উৎপাদন বন্ধ। এবং ছাঁটাই। গোটা দুনিয়া জুড়ে শেয়ার বাজারে ধস। ইউরোপ, আমেরিকার ফিনান্সিয়াল জায়েন্টরা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে আগেই। যত সময় এগিয়েছে তার প্রভাব পড়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পেও। আমাদের দেশে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শিল্প

উৎপাদন কমতে কমতে গত এক দশকের মধ্যে সব থেকে নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কাজ তৈরি হওয়া তো দূরের কথা। কাজ হারানোর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। কমছে মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ। 'ইমিগ্রেন্টস'-দের দেশের শত্রু বানিয়ে চাষ চলছে ঘৃণার রাজনীতির। ট্রাম্প থেকে মোদী, কর্পোরেট লুটের রাস্তা চওড়া করে 'বহিরাগতদের' তাড়ানোর রাস্তা বানাচ্ছেন। এরকমই এক মহামারীর মতো পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল গোটা দুনিয়া। ২০০৭-০৮ সালের বিশ্বজোড়া সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছিল না পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদের কাঠামোগত সঙ্কট। যা বারবার ফিরে আসে। আর এই সঙ্কটের প্রতিকার হিসাবে পুঁজিবাদ ধ্বংস করে নিজেরই উৎপাদন ক্ষমতাকে।

ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস্ বলছেন :

In these crisis [Periodic crisis of capitalism] a great part not only of the existing products, but also of the previously created productive forces, are periodically, destroyed. In these crisis there breaks out an epidemic that, in all earlier epochs, would have schemed an absurdity – the epidemic of over production.

অতি উৎপাদনের মহামারী। পুঁজিবাদ মানেই তাই। মজুরির তুল্য যা, পণ্যের মূল্য তার চেয়ে বেশি না হলে মুনাফা হয় না। তাই বাজারের কেনার ক্ষমতা থেকে পণ্যের পরিমাণ বেশি হয়ে পড়ে। আর এখানেই সঙ্কট। এই সঙ্কট মোকাবিলায় পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হয় তার উৎপাদিকা শক্তিকেই। এবং এক্ষেত্রে পুঁজি উৎপাদিকা শক্তির যেখানে প্রথম আঘাত আনে তা মানুষের শ্রম। অর্থাৎ জ্যান্ত রক্ত মাংসের শ্রমিক, তাকেই ধ্বংস করো। ছাঁটাই করো। পুঁজিবাদী সঙ্কট মানেই নতুন করে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকা।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, একশো শতাংশ কর্মসংস্থান আসলে পুঁজিবাদে অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দু-একটি দেশে বেকারি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে গেছিল বটে। তবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সেনাবাহিনীতে বিপুল হারে নিয়োগ। তা বাদ দিলে, দেখা যাবে বেকারি আসলে পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ক্যাপিটাল ১-এ মার্কস বলছেন :–

But if a surplus labouring population is a necessary product of accumulation or of the development of wealth

on a capitalist basis, this surplus population become, conversely, the lever of capitalistic accumulation, may, a condition of existence of the capitalist mode of production. If forms a disposable industrial reserve army, that belongs to capital quite as absolutely as if the letter had bred it at its own cost.

মজুত বাহিনী যত বড়, কর্মরত শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা তত কম

যত পুঁজিবাদ বিকশিত হয় তত সে কম লোক দিয়ে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, তত তৈরি হয় 'surplus population'। মার্কস তাকে বলেছেন 'Reserve army of Labour'। শ্রমের মজুত বাহিনী। মজুত বাহিনী যত বড়, কর্মরত শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা তত কম। কিন্তু এই বিপুল মজুত বাহিনী নিজের শ্রমশক্তিকে পুঁজির কাছে বিক্রি করার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করতেও অক্ষম। কারণ, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ তার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের উপকরণের থেকে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা হলো পুঁজিবাদের প্রাথমিক শর্ত।

মার্কস *ক্যাপিটাল*-১-এ বলছেন :

The capitalist system presuposses the complete separation of the labourer from all property in the means by which they can realize their labour as soon as Capitalist production is once on its leg it not only maintains this separation but reproduces it on a continually extending scale.

উৎপাদনের সমস্ত রকমের উপাদান মানুষের থেকে কেড়ে নিয়েই পুঁজিবাদ এগোয়। ওপরের উদ্ধৃতিটির শেষ অংশটুকু আরও গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বলা হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়া কখনো বন্ধ হয় না, যত পুঁজিবাদ এগোয় তত তা বাড়তে থাকে (on a continually extending scale)। তাই সঙ্কট মোকাবিলায় পুঁজিবাদ ক্রমশ থাবা বসাতে থাকে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদকের অধীনে ছিল। জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উৎখাত, অতঃপর জমি থেকে কৃষকের উৎখাত, রিটেল জায়েন্টদের হাতে ছোট ব্যবসার উৎখাত ইত্যাদি। মানে আরও নতুন বেকার। 'শ্রমের মজুত বাহিনীতে' আরও নতুন নতুন লোকের অন্তর্ভুক্তি।

এই মজুত বাহিনী হলো, 'Disposable Workers' অর্থাৎ পুঁজির চলাচলের সাথে এদের যেমন খুশি Dispose (পুঁজির গতি অনুযায়ী বিন্যস্ত) করা যায়, মানে পুঁজি যেখানে যেরকম যাবে এদের সেরকম দৌড় করানো যায়। হ্যারি ম্যাগডফ এবং ফ্রেড ম্যাকডফ আজকের সময়ের এই 'মজুতবাহিনী'কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন –

১) পুরোপুরি বেকার। যাদের কাজের প্রয়োজন বলে কাজ খুঁজছেন। বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত দিয়ে রেখেছেন। এবং যাদের কাজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে কাজ খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

২) পার্ট টাইম কাজের সাথে যুক্ত, কিন্তু ফুল টাইম কাজ খুঁজছেন।

৩) স্বনিযুক্ত বা নিজেই কোনও না কোনওভাবে রোজগারের ব্যবস্থা করছেন। যাদের কাজ এবং আয় ক্রমশ ওঠানামা করে। তাই তারাও স্থায়ী কাজের সন্ধান করছেন।

৪) যারা কাজ করছেন, কিন্তু যে কোনও সময় কাজ হারাতে পারেন। এই অংশের মধ্যে কারখানার অস্থায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে মরশুমের পর মরশুম ফসলের ঠিক ঠিক দাম না পাওয়া কৃষকরাও আছেন।

৫) যাদের অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার স্বাভাবিকভাবে কথা থাকে না, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কাজে লাগানো যায়। যেমন, জেলের কয়েদি।

[Monthly Review, April 2004 দ্রষ্টব্য]

এর সাথে আমরা আরেকটা অংশকেও যুক্ত করতে পারি। যারা এখন কাজ করছেন না, কিন্তু ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এবং অন্যান্য কারণে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত বা কাজের সন্ধানে বেরোতে হবে (ওপরের তালিকায় ১,২ বা ৩ বর্গে তারা যুক্ত হবেন)। যাদের মধ্যে এর বড় অংশ হলেন মেয়েরা। গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ বেকারি, কাজের অস্থায়িত্ব এবং flexibility'র নামে শোষণের মাত্রা এবং ছাঁটাইয়ের সুযোগকেই প্রসারিত করেছে। তাই বেকার এবং সম্ভাব্য বেকার বা আধা বেকার (Pseudo unemployed)-এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে গোটা দুনিয়ার সামনে হাজির হয়েছে কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিক।

গোটা দুনিয়াজোড়া লকডাউন। অনেক দেশেই কোনও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই লকডাউন ঘোষণা হয়েছে। আমাদের দেশেও তাই

হয়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (CMIE) বলছে মার্চে আমাদের দেশে বেকারির হার ছিল ৮.৭৪%। আর গত ৩ মে-র হিসাব অনুযায়ী তা বেড়ে হয়েছে ২৭.১১%। কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্মাণশিল্প, কার্যত সর্বত্র কর্মচ্যুত হচ্ছে। এমনকি NASSCOM ২৮০০ আই টি কোম্পানি যার সদস্য, কর্মচ্যুতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছে। গোটা দুনিয়ার চিত্র একই। সারা বিশ্বে মাস-মাহিনা (salaried employee) পাওনা লোকের সংখ্যা ২১% কমেছে গত একমাসে। এমনকি বৃহৎ সংস্থায় কাজ করতেন এরকম শ্রমিকের ২৩% ইতিমধ্যে কাজ হারিয়েছেন। আমাদের দেশেও কোকাকোলা থেকে বিগবাজার, সবাই ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নিচ্ছেন। অসংখ্য সংস্থা তাদের কর্মীদের মাহিনা বন্ধ করে দিয়েছে। লকডাউনের মধ্যেও তাদের টার্গেট পূরণ না করলে ছাঁটাইয়ের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাজ বন্ধ, কাজ নেই, ভবিষ্যতে কাজ হারানোর সম্ভাবনা। পূর্বে উল্লিখিত 'Disposable Worker' পাঁচটি বর্গের মধ্যে ৪ নম্বরটির দিকে তাকালে দেখব, কার্যত গোটা দুনিয়ার সিংহভাগ কর্মরত মানুষ আসলে এখন এই অংশের মধ্যে পড়েন। যারা জানেন তাঁদের কাজ আছে, বা হয়ত আছে কিন্তু ভবিষ্যতে আর থাকবে না বা না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যারা পুরোপুরি বেকার তাদের আপাতত কোনও নতুন কাজের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যাদের কাজ পার্ট টাইম, তাঁদেরও ফুল টাইম কাজের সুযোগ নেই। যাঁরা স্বনিযুক্ত, তাদের কাজ ও আয় আসলে বাজারের ওঠানামার সাথে যুক্ত। অংশত সে ক্ষেত্রেও কোনও উন্নতির বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয় এক সমীক্ষায় জানাচ্ছে ৬৭% ভারতীয় এই সময়ে কাজ হারিয়েছেন। যার মধ্যে আছেন

শহরের স্বনিযুক্তদের মধ্যে ৮৪%, ক্যাজুয়াল বা পার্ট টাইম কর্মীদের ৮১%, গ্রামাঞ্চলের দিনমজুরদের ৬৬%, শহর এবং গ্রামে মাসিক বেতনভোগীদের যথাক্রমে ৭২% এবং ৬৬%। সম্ভবত শ্রমের এত বিরাট 'মজুতবাহিনী' আগে কখনও পুঁজিবাদ দেখেনি। কারণ শ্রমজীবী মানুষের বেশিরভাগ লোককেই গত দু'মাসে 'রিজার্ভ' তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

গোটা দুনিয়ায় আলোচনা চলছে যে করোনা পরবর্তী অর্থনীতিটা কেমন হবে তা নিয়ে। কোনও ভবিষ্যৎবাণী না করেও বলা যায় দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটে নিমজ্জিত পুঁজিবাদ কি রাস্তা নিতে পারে তার কিছু লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, পুঁজির আরও বেশি কেন্দ্রীভবনের দিকেই হাঁটছে এই বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ফেসবুকের মালিক জুকেরবার্গ ঘোষণা করেছেন তিনি আম্বানির রিলায়েন্স জিও-তে ৫.৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবেন। ডিজিটাল মিডিয়া কোম্পানি Zoom ইতিমধ্যেই তথ্য আদান-প্রদানের সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট সংস্থা Key base-কে অধিগ্রহণ করেছে। Uber-এর খাবার ডেলিভারি সংস্থা Uber eats-এর লোকসান সামলাতে তারা Grubhub নামক একটি খাবার ডেলিভারি সংস্থাকে কিনে নিয়েছে। এই লকডাউনের মধ্যেই প্রতিদিন মার্জার এবং অ্যাকুইজিশনের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। পুঁজির কেন্দ্রীভবন মানেই মজুরি শ্রমের তুলনায় পুঁজির আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা। আরও বেশি শোষণ। দ্বিতীয়ত, আরও বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের জন্য সরাসরি কাজের ঘণ্টা বাড়ানো এবং শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনের দিকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সরকারিভাবেই বলা হচ্ছে যে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ সহ একাধিক সরকার সমস্ত রকম শ্রম আইন বাতিল করে শ্রমিককে আরও বেগার খাটানোর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। Artificial Intelligence সহ বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে জোর চর্চা চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে যাতে কত কম শ্রমিক নিয়োজিত করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তৃতীয়ত, সরাসরি লুট, মানুষের সম্পদ লুট। এখনও অবধি যা মানুষের সম্পত্তি ছিল (ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, বা রাষ্ট্রীয় চেহারায়) তাকে পুঁজির কাছে হস্তান্তরিত করা। মানুষের অধিকার অর্জিত অর্থ দিয়ে পুঁজিপতিদের 'বেল আউট'। লকডাউন চলাকালীন সময়েই বৃহৎ পুঁজিকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা।
 নির্মলা সীতারমন যেভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের (MSME) সংজ্ঞা পরিবর্তন

করছেন তাতে আশঙ্কা করাই যায় যে ছোট ব্যবসা থেকে ছোট উৎপাদকরা বড় পুঁজির সামনে আরও অসহায় হয়ে পড়তে পারে অদূর ভবিষ্যতেই।

এই সমস্ত প্রবণতাই পুঁজি ও মজুরি শ্রমের ভারসাম্যকে আরও বেশি করে পুঁজির পক্ষে চালিত করার শামিল। যা ভবিষ্যতে কাজে যুক্ত থাকা শ্রমজীবী মানুষ এবং কাজ খুঁজতে থাকা সম্ভাব্য শ্রমিকদের দরকষাকষির শক্তিকে দুর্বল করতে পারে (এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা ভালো তা হলো এই যে আজকে যে শ্রমিক সে কাল শ্রমিক নাও থাকতে পারে এবং উলটোটাও, কারণ 'মজুরী শ্রম' একটি সামাজিক বর্গ, কারো জন্মগত পরিচয় নয়)। যার মানে দাঁড়াচ্ছে বেকারি এবং বিশেষ করে আধা বেকারির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়া।

ক্যাপিটাল ১-এ মার্কস বলছেন :–

The whole form of the movement of modern industry depends, Therefore, upon the constant transformation of a part of the labouring population into unemployed and half-employed hands.

পুঁজিবাদ আছে মানেই বেকারি ও আধা বেকারি থাকবেই। আবার পুঁজি আছে মানেই মজুরি শ্রমও থাকবে। কিন্তু কাজ বাড়বে না বেকারি বাড়বে তা নির্ভর করে পুঁজি ও মজুরি শ্রমের মধ্যে লড়াইয়ে ভারসাম্য কোনদিকে ঝুঁকছে তার ওপর। অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামের ভারসাম্য কোনদিকে তার ওপর। সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ শোষণের মাত্রাকে আরও বাড়ানোর চেষ্টায় শামিল। করোনা প্যান্ডেমিক এক যুগ ধরে চলা সঙ্কটের সামনে হয়ত একটি 'পুনর্গঠনের' সুযোগও এনে দিয়েছে। আবার সারা দুনিয়ায় এটাও চর্চা হচ্ছে যে এই প্যান্ডেমিক পুঁজিবাদের অন্তঃসারশূন্যতাকেও উন্মোচিত করেছে। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদ। প্যান্ডেমিক পরবর্তী দুনিয়া দেখবে কোটি কোটি কর্মহীন, কর্মচ্যুত মানুষকে যাঁরা এই মহামারীর সময় তাদের কাজ হারিয়েছেন বা যাঁদের ভবিষ্যতের কাজের সুযোগ হারিয়ে গেছে। লকডাউন শেষের পৃথিবী এই কোটি কোটি মানুষের জীবিকা রক্ষা ও জীবিকা সন্ধানের যুদ্ধক্ষেত্র।

অতিমারী, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ব

তৌষালী রায়না

ফরাসী কাহিনীকার ল্যে মুইসিস ১৩৪৯ সালে তাঁর লেখা এক বইতে সেইসময়ে প্লেগ মহামারীর বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্রামে কয়েকজন ইহুদী মানুষকে প্লেগের সংক্রমণ ঘটানোর সন্দেহে বেঁধে মারা হচ্ছে। প্রায় ৭০০ বছর পরে ভারতের উত্তর দিল্লির এক গ্রামে এই একই ছবির বাস্তবায়ন ঘটে। কিছু হিন্দু যুবক একজোট হয়ে এক মুসলিম যুবককে কোভিড আক্রান্ত সন্দেহে ভয়ানক ভাবে মারে। অতীতের অতিমারীর সময়ের অনেক ভয়ানক ঘটনা বা ছবি আমরা দেখেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে একবিংশ শতকের

এখনো অব্দি সবথেকে বড় অতিমারী সাম্প্রদায়িক হিংসার জঘন্যতম রূপ প্রকাশিত করে দিয়েছে। ভারত শুধু করোনা অতিমারীর সাথে লড়ছে না, একইসঙ্গে এই অতিমারীর সাম্প্রদায়িকীকরণের সাথেও ভারত কে লড়তে হচ্ছে। তবে এই ঘটনাগুলি অতিমারীর সময়ে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধর্মীয় বিদ্বেষের রাজনীতি করা একটা দৈনন্দিন বিষয় হয়ে গেছে আমাদের দেশে এবং এই অতিমারীর সাম্প্রদায়িকীকরণ সেই নিয়মানুগ বিদ্বেষ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রসারিত করছে মাত্র। এবং এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বের মদতপুষ্ট।

ভারতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ স্পষ্ট হয় মার্চের মধ্যবর্তী সময় থেকে। লক্ষনীয় ব্যাপার যে প্রথম থেকেই ভারতে করোনা ভাইরাসকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নয় বরং স্বাজাতিকতার (Racism) মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে। যেহেতু চীনের উহানে প্রথম এই ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাই একে 'চীনা ভাইরাস' বলে প্রচার চালানো শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাইনিজ বংশদ্ভুত বা নেপালি বা উত্তর-পূর্বের অন্যান্য বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের এর ফলে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের ও অপমানের স্বীকার হতে হয়। কিন্তু মার্চ মাসের শেষের দিকে যখন থেকে ভারতে করোনার প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছেন তখন থেকেই এই অতিমারীর সমস্ত দায় মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে এর সাম্প্রদায়িকীকরণ শুরু হয়ে যায়। সংবাদমাধ্যম এবং গণমাধ্যমগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ২১শে মার্চ থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এই খবর সম্প্রচার করতে থাকে যে 'ইসলামিক সমাবেশ' এর ফলে ভারতে করোনার সংক্রমণ ভয়ানক আকার ধারণ করতে চলেছে এবং গোষ্ঠীস্তরে করোনা থাবা বসাতে চলেছে। দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কেজ মসজিদে তবলিঘি জামাত নামক এক ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় মার্চের শুরুর দিকে। এই তবলিঘি জামাতের সমাবেশে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্ম সম্প্রচারক এবং উলেমারা এসে যোগদান করেন এবং তাদের সঙ্গদান করেন আরো অনেক ভারতীয় মুসলিমরা। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সংক্রমিত ছিলেন, সেটা প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়েনি, কারণ ভারতে তখনো বিপুল পরিমাণে টেস্টিং শুরু হয়নি এবং এই ভাইরাস সম্পর্কে সরকারী তরফে মানুষকে সতর্কও করা হয়নি। এনারা সমাবেশ শেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ফেরেন এবং এই কোভিড রোগের স্বাভাবিক নিয়ম

অনুযায়ী হয়তো আরো কিছু জনের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয় সমগ্র দেশে। এই সময় ভারতে অন্যান্য জায়গায় আগাম সতর্কতার অভাবে অন্যান্য ধর্মের ও বেশকিছু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলি শুধুমাত্র এই তবলিঘি জামাতের সমাবেশের ঘটনাই প্রচার করতে থাকে। প্রাথমিক ভাবে তবলিঘি জামাতের সাথে সমস্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের এক করে দেওয়া হয় এবং এই পুরো সংক্রমণের দায় মুসলিম জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভাষার সূক্ষ্ম অদলবদলে অচিরেই তবলিঘি জামাতের সমাবেশ 'ইসলামিক সমাবেশ' হয়ে যায়। এর পরে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয় করোনা জিহাদের আখ্যান। এখানে বলা হয় যে এই তবলিঘি জামাতে অংশগ্রহণকারী মুসলিমরা আসলে একপ্রকার জিহাদ শুরু করতে চাইছে, তারা করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে চাইছে সারা দেশে। অর্থাৎ ওই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা কেউ করোনা ভাইরাসের দ্বারা 'আক্রান্ত' হননি বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে করোনা ভাইরাস শরীরে বহন করে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। এবং এই 'জিহাদ' শব্দটিকেও এমন ভাবে ব্যাবহার করা হচ্ছে যাতে এটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে মুসলিমরা করোনা ভাইরাস কে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সন্ত্রাস করতে চাইছে। মুসলিমরা সম্ভাব্য ভাইরাসবাহক এটা প্রচার করে শুধুমাত্র ধর্মীয় শত্রু নয় জীবনের শত্রু বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ক্রমাগত বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে ভুল তথ্য, বিকৃত ছবি, ভিডিওর আদানপ্রদান বিদ্বেষ কে আরো বাড়িয়ে তুলছে

এসবের সাথে ক্রমাগত বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে ভুল তথ্য, বিকৃত ছবি, ভিডিওর আদানপ্রদান বিদ্বেষকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। এই বিদ্বেষ যে মানুষের মনে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে তা বোঝা গেছে

বিভিন্ন ঘটনায়। দৈনন্দিনভাবে কোথাও মুসলিম কর্মীর হাত থেকে খাবার নিতে অস্বীকার করা বা মুসলিম নিরাপত্তা কর্মীকে সন্দেহের বশে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত করা, বা মুসলিমদের করোনা ভাইরাস বলে সম্বোধন করা থেকে শুরু করে মুসলিমদের গণপ্রহার করা সবরকম খবরই উঠে আসছে। এমনকি পরিস্থিতি এমন ভয়ানক জায়গায় যাচ্ছে যে তা দাঙ্গার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যদিও এই অশান্তি তৈরির ক্ষেত্রে মিডিয়া বিশাল বড় ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু মিডিয়া এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নয় এবং সে শাসকশ্রেণির হয়ে কার্যসম্পাদন করছে। কার্যসম্পাদন মানে এখানে নোয়াম চমস্কির ধারণা ধার করে বলা যায় যে শাসকশ্রেণির আদর্শের পক্ষে সম্মতি নির্মাণ করা। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক শাসকশ্রেণি হিন্দুত্ববাদের আদর্শে বিশ্বাসী এবং এই হিন্দুত্ববাদের আদর্শের চিরকালীন শত্রু হলো মুসলিম সম্প্রদায়।

হিন্দুত্ব শব্দটির প্রথম ব্যাবহার এবং ব্যাখ্যা করেন সাভারকার। এবং এই হিন্দুত্বের ধারনার মধ্যে তিনি প্রথমবার হিন্দু ধর্মের পরিচিতিকে একটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেন যে ভারতবর্ষে একজন হিন্দুকে। সাভারকার প্রদত্ত একজন প্রকৃত হিন্দুর সংজ্ঞা যা একাধারে ধার্মিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক তা মুসলিমদের কোনভাবেই ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে মান্যতা দেয় না। পুরোপুরিভাবে সমসত্বতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ধারণা মুসলিমদের শুধু হিন্দুদের থেকে আলাদা নয় বরং তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। এই হিন্দুত্বের এক চিরকালীন শত্রু দরকার এবং তাকে দানবিক ভাবে দেখানোর দরকার যাতে সাধারণ জনগণের কাছে তাদের মানুষ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ভারতে বিগত বেশ কিছু বৎসর ধরেই মিডিয়া সেই হিন্দুত্ববাদের আদর্শের স্বপক্ষে ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাধারন জনগণের সম্মতি নির্মাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে করোনা বিপর্যয় এই হিন্দুত্ববাদী শাসকশ্রেণির হাতে আরেকটি অস্ত্র তুলে দিয়েছে যা দিয়ে তারা আরো প্রবল ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং মুসলিমদের এই দানবিকীকরণ ভারতের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়, বর্তমানে অতিমারীর সময় এটি আরেকটু বেশি ভয়ানক ভাবে দেখা যাচ্ছে।

তবে এই ঘটনা যে শুধুমাত্র ভারতে ঘটছে তা নয়। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বেই চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলি ও নব্য-ফ্যাসিবাদী দল/গোষ্ঠীগুলি একইরকম ভাবে এই অতিমারীকে ব্যাবহার করে

তবলিগি জামাতকে অজুহাত করে সংগঠিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ

বিভাজনের রাজনীতির পথ প্রশস্ত করছে। হ্যানা আরেন্ড তাঁর 'The Origins of Totalitarianism' বইটিতে নাৎসি জার্মানীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বাস্তব পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সর্বগ্রাসী রাজনীতি তার আদর্শকে একইসাথে প্রসারিত এবং জাহির করে। আদর্শগতভাবে ফ্যাসিবাদ এক সর্বগ্রাসী এবং চরম পাশবিক ধারনা যা নিজের শত্রুকে চিহ্নিত করে তাকে নিপীড়ন করার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে। ওনার এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলা যায় যে বিভিন্ন দেশে এই অতিমারীর বাস্তব অবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে কিছু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এবং পরবর্তীকালে তাদের ওপর অত্যাচারের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য। ইতালির দক্ষিণপন্থী লীগ পার্টির নেতা মাত্তেও সালভিনি সরাসরি ওই দেশের শরণার্থীদেরকে করোনার সংক্রমণের জন্য দায়ী করেছেন। আমেরিকা তে রিপাবলিকান পার্টির সদস্যরা এবং white supremacist-রা আফ্রো-আমেরিকান, মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কোভিড রোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তাদের সাথে নীতিগত বৈষম্যের দাবি তুলেছেন। এছাড়াও ব্রিটেন, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশগুলিতে যেখানে ইতিমধ্যেই দক্ষিণপন্থী দলগুলি ক্ষমতায় আছে সেখানে সংখ্যালঘুদেরকে একইভাবে করোনার সংক্রমণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে এবং তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও নিপীড়নের বা বিভাজনের রাজনীতির ধরনটা অনেকটা একই, খালি নিপীড়িত সম্প্রদায়টি শরণার্থী বা আফ্রো-আমেরিকানের বদলে মুসলিমরা।

এছাড়াও উল্লেখ্য যে এই করোনা ভাইরাস বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার কাঠামোগত খুঁতগুলি প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। দেশগুলি এই সময়ে যে চরম স্বাস্থ্য সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাতে এই পুঁজিবাদী কাঠামো এবং সরকার অনেকাংশে দায়ী। প্রায় সমস্ত দেশেই ইতিমধ্যে বর্তমান আর্থ-সামজিক বৈষম্য এবং তার ওপর সরকারী তরফে আগাম পরিকল্পনার অভাব, পর্যাপ্ত জন-স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব, আগাম সতর্কতার অভাব জনগণকে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই স্বাস্থ্য সংকটের ফলে মানুষের মনে ভয় এবং আশঙ্কার উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রায় সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এমতাবস্থায় সরকারের এবং এই পুঁজিবাদী ব্যাবস্থার ব্যার্থতা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া এবং মানুষের মনের এই ভয়কে ব্যাবহার করা দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিবাদী রাজনীতির একটি অন্যতম কৌশল। ভারতেও আমরা দেখেছি যে প্রথম থেকে কীভাবে দেশের মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন। চাকরির নিশ্চয়তা নেই, পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা নেই এবং তার মধ্যে ভয়ানক এই রোগের চিকিৎসার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্রও সামনে এসেছে। বর্তমান সরকার এই স্বাস্থ্য সংকট এর সাথে মোকাবিলা করতে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে করোনাকে কাজে লাগিয়ে দুই ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করছে। এক, মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর সংক্রমণের দায় ন্যাস্ত করলে এই সরকারের নিজেদের ব্যার্থতার ভার লাঘব হবে; দুই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কে কাজে লাগিয়ে করোনা পরবর্তী সময়ে হিন্দুত্বের ভাষ্যকে আরো শক্তিশালী করা যাবে ও মুসলিমদের ওপর নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করা যাবে।

ভারতের ক্ষেত্রে করোনা পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরো বেশি তার কারণ ভারতে ইতিমধ্যেই এক ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ব রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। এই হিন্দুত্ব ক্লাসিকাল ফ্যাসিবাদের প্রায় সব লক্ষণই বহন করে। অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক বেঞ্জামিন জাকারিয়া সঠিকভাবেই উক্তি করেছিলেন যে ভারতে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন পৃথিবীর দীর্ঘতম ফ্যাসিবাদী আন্দোলন। ১৯২৫ এ আরএসএস স্থাপিত হবার পর থেকেই সংগঠিতভাবে হিন্দুত্ববাদের আন্দোলন শুরু হয় ভারতে। অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার

পর একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন যে হিন্দুত্ববাদ আদর্শগতভাবে, কার্যপদ্ধতিতে এবং শ্রেণিগত দিক থেকে একেবারেই ফ্যাসিবাদী। ফ্যাসিবাদ যেরকম সমসত্বতার ওপর ভিত্তি করে জাতিগত পরিচিতির আধিপত্য বিস্তার করার কথা বলে, হিন্দুত্বও সেই একইভাবে ধর্মীয় পরিচিতির ওপর ভিত্তি করে আধিপত্য বিস্তারের কথা বলে। ক্ল্যাসিকাল ফ্যাসিবাদের মতই হিন্দুত্ববাদের ও এক কল্পিত শত্রু দরকার। যেই শত্রুকে হিন্দুদের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী করা যায়। সুতরাং জার্মান ফ্যাসিবাদে ইহুদীদের যা জায়গা হিন্দুত্বেও মুসলিমদের সেই একই জায়গা। এবং এই কল্পিত শত্রুকে শেষ করার জন্য হিংসার যে কোন পর্যায়ে যাওয়ার অনুমতিও দুই আদর্শই দেয়। কার্যপদ্ধতিতেও হিন্দুত্ববাদ ও ফ্যাসিবাদে একইভাবে প্রতীকিবাদ, মিথ্যাচারণ, গুজব ছড়ানো, মিডিয়াকে কাজে লাগানো, ভিন্নমত পোষণ না করতে দেওয়া ইত্যাদির ওপরে জোর দেয়। এছাড়া শ্রেণি সমর্থনের দিক থেকেও জার্মান ফ্যাসিজমের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন এসেছিলো পেটি বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শহরের ছোট শিল্পী, চাকুরিজীবী, প্রযুক্তিবিদ, বুদ্ধিজীবী, দরিদ্র কৃষক অংশ থেকে। একবিংশ শতকে এই সমস্ত অংশের সাথে বড় বুর্জোয়া এবং কর্পোরেট পুজিপতিরাও ফ্যাসিবাদকে আরো শক্তিশালী করতে মদত দিচ্ছে। ভারতবর্ষেও হিন্দুত্ববাদের জনসমর্থনের শ্রেণি বিন্যাস করলে একই ফল পাওয়া যাবে।

শেষে বলা যায় যে এই অতিমারীর সময়ে যে সাম্প্রদায়িকতার আবহ তৈরি হয়েছে, তা হিন্দুত্ববাদের দীর্ঘমেয়াদী social engineering এর ফল। এর শিকড় মানুষের মনে এত গভীরে প্রোথিত হয়েছে যে একে নির্মূল করা বেশ কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। করোনা পরবর্তী সময় মুসলিমদের জন্য খুবই কঠিন হতে চলেছে। একইসাথে এই ধর্মীয় ঘৃণার ফলে সাম্প্রতিক অতীতের নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সারা দেশজুড়ে গড়ে উঠেছিলো তার মান্যতা এবং মুসলিমদের নাগরিকত্বের বৈধতা অস্বীকার করা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পক্ষে আরো সহজ হয়ে যাবে। তবে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ফ্যাসিবাদের কার্যপদ্ধতি এবং উৎসের প্রেক্ষাপটে রেখে বুঝতে হবে। মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ নিকো পুলাঞ্জো তাঁর Fascism and Dictatorship :The Third International and the problem of fascism বইটিতে লিখেছেন যে ফ্যাসিবাদ
 শুধু রাজনৈতিক আদর্শ নয়, এর সাথে আর্থনৈতিক কাঠামোর গভীর

সম্পর্ক রয়েছে। ফ্যাসিবাদের উত্থানের পিছনে অর্থনৈতিক সংকট ও একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেই মন্দা উদ্ভুত অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে জার্মান ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রায় সমস্ত অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলে দিয়েছেন যে করোনা পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ দিকে যাবে। ভারতের মতো দেশে যে এর প্রবল প্রভাব পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং সেই পরিস্থিতিতে সমস্ত দেশের মতোই ভারতবর্ষেও ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বের আধিপত্য আরো প্রবল হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঁকের মুখে বিশ্ব

শান্তনু দে

ঠিক সময়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই তৎপর না হলে বোমা বিস্ফোরণে এতদিনে উড়ে যেত করোনা-রোগী ভর্তি মিসৌরির হাসপাতাল।

মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে বোমা বানানোর কাজ শুরু করেছিলেন মার্কিন নব্য-নাৎসি তিমোথি উইলসন। লক্ষ্য ছিল মিসৌরির হাসপাতাল, যেখানে তখন কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা চলছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি ছিল উদ্দেশ্য।

২৬ মার্চ, বিবিসি'র শিরোনাম: 'মিসৌরির হাসপাতালে বোমা হামলার

চক্রী নিহত, জানিয়েছে এফবিআই।' পুলিশ উইলসনকে তাঁর নিজের বাড়িতেই গুলি করে হত্যা করে। মার্কিন কেন্দ্রীয় সুরক্ষা পরিষেবা জানায়, অভিবাসী মহল্লায় রোগ ছড়ানোর জন্য 'দরজার হাতলে কেশে আসার' কৌশল নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা হয়েছিল নব্য-নাৎসি ফোরামগুলিতে।

মহামারিকে আসলেই বড় তোফা হিসেবে দেখছে নব্য-নাৎসি ও উগ্র দক্ষিণপন্থীরা।

ব্রিটিশ দ্য অবজারভার পত্রিকায় শিরোনাম: 'নিজের অ্যাজেন্ডাকে চাম্পিয়ান করতে এবং সমর্থন বাড়াতে করোনাভাইরাস সঙ্কটকে হাইজ্যাক করছে উগ্র দক্ষিণপন্থীরা।' বিকৃত প্রচারের উপর নজর রাখা সম্প্রচার সংস্থা জিঙ্ক নেটওয়ার্ক জানাচ্ছে, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির একটি স্পষ্ট অভিমুখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তারা 'তাদের মূল অভিযোগগুলির প্রাসঙ্গিকতা আনা, দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমর্থন বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করছে মহামারিকে।' জিঙ্কের অধিকর্তা লুইস ব্রুক যেমন বলেছেন, 'যেসব তথ্যপ্রমান আমরা বেআব্রু করেছি, তাতে স্পষ্ট, ব্রিটেনে উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি কোভিড-১৯কে ব্যবহার করছে ফ্যাসিবাদের ব্রিটিশ রূপ দেওয়ার কাজে।' যেমন দাবি করা হচ্ছে, ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী অভিবাসীরা।

৯ মে, ১৯৪৫। ফ্যাসিবাদের নির্ণায়ক পরাজয়। রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা। বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বর যুদ্ধের সমাপ্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে। শুধু ২ কোটি ৭০ লক্ষ রুশ নাগরিকেরই জীবনদান। ব্রাউনশার্টস। রাসায়নিক গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা। অশউইৎজ বন্দিশিবির। নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। শেষে ৩০ এপ্রিল, ব্যাঙ্কারে হিটলারের আত্মহত্যা। পঁচাত্তর বছর আগে সেদিন বার্লিনের রাস্তায় লালফৌজ। আর উদ্বেল জনতা।

সেদিন ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি।

ফ্যাসিবাদ বেঁচে আছে উগ্র দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদে। রাডিক্যাল, ধর্মীয় পরিচিতিসত্ত্বা-তাড়িত সংখ্যাগুরুবাদে। আগ্রাসী আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির দৌরাত্ম্যে। এবং অমানবিক নয়া উদার আগ্রাসনে। পঁচাত্তর বছর আগে সেদিনের যুদ্ধে জয় এসেছিল ঠিকই, কিন্তু বিশ্ব মানবতা এখনও চূড়ান্ত বিজয়ের অপেক্ষায়।

 নয়া উদারবাদ শুধু মানবতার ক্ষেত্রে ব্যাপক সর্বনাশ ডেকে

আনেনি। একইসঙ্গে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে প্রকৃতিতে। বিশ্বায়িত উষ্ণায়ন, বেপরোয়া অরণ্য নিধন, নির্বিচারে খনন, মাত্রারিক্ত বায়ুদূষণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন— দুর্বল করেছে প্রকৃতিকে। আর যে কারণে ছড়িয়ে পড়ছে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু এবং এখন কোভিড-১৯'র মতো রোগ। পরিবেশের উপর নিরন্তর তাণ্ডব তৈরি করেছে এই পরিস্থিতি, যা আজকের মতো সঙ্কট তৈরি করে যাবে ভবিষ্যতেও।

ভাইরাস প্রকৃতির ফসল। আর সঙ্কট নয়া উদারবাদের ফসল। পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি

করোনা হলো ভাইরাস, মহামারি হলো পুঁজিবাদ।

ভাইরাস প্রকৃতির ফসল। আর সঙ্কট নয়া উদারবাদের ফসল। পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি। ভাইরাস এই সমাজকে ধ্বংস করছে না। বরং, একটা পচাগলা সমাজকে লড়তে হচ্ছে নিষ্ঠুর ভাইরাসের বিরুদ্ধে। নয়া উদার সব সরকার দৃশ্যতই দিশেহারা। অপ্রস্তুত। যুদ্ধবিমান আছে। ভেন্টিলেটর নেই। ক্ষেপণাস্ত্র আছে। মাস্ক নেই।

করোনা বেআব্রু করেছে কয়েকদশক ধরে চলা বেপরোয়া বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভয়াবহ পরিণতিকে। শ্রমিক ও সামাজিক অধিকারের উপর ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান আক্রমণকে। জীবনের জন্য এবং জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য জরুরি পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিচ্ছিন্নতাকে। প্রকট করেছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার বিপন্নতাকে। তুলে ধরেছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দেউলিয়া চেহারা আর পুঁজিবাদের অক্ষমতাকে।

'আরেকটি মহামারি তাড়া করছে করোনাভাইরাসকে: ক্ষুধার মহামারি, নিরক্ষরতা আর দারিদ্রের মহামারি।' এই আর্তনাদ শুনিয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। 'করোনা নয়, তার আগে খিদেই আমাদের মেরে ফেলবে।' বলছেন ভারতের অসহায় হতদরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষ। সংবাদ সংস্থা বিবিসি-কে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী শুনিয়েছে, এ বছরের শেষে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে হবে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ।

‘আমরা শুধু বিশ্বায়িত স্বাস্থ্য মহামারির মুখোমুখি নই, বিশ্বায়িত মানবিক বিপর্যয়েরও মুখোমুখি।’ বলেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অধিকর্তা ডেভিড বার্লে।

‘তিন-ডজন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখতে হতে পারে আমাদের।’ নিরাপত্তা পরিষদকে এই সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন বার্লে। ‘মহামারি সঙ্গে নিয়ে আসছে আরেকটিকে।’ শিরোনাম টাইমসের উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে। নিকোলাস ক্রিস্তফ তাতে বলেছেন, ‘উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য অপেক্ষা করছে আরও দুর্দশা।’

একুশে মে, মার্কিন ডাকসাইটে আর্থিক পত্রিকা ফরচুনে আর্তনাদ: মার্কিনমুলুকে প্রকৃত বেকারত্বের হার ছাড়িয়েছে সাড়ে ২২ শতাংশ। যা মহামন্দার সময়ে সর্বোচ্চ শিখরে (১৯৩৩) পৌঁছনো বেকারত্বের হার ২৫.৬ শতাংশের ঠিক নিচে। মার্কিন শ্রমদপ্তরের হিসেবে, মহামারির সময় (মধ্য-মার্চ থেকে) বেকারভাতার জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। যা মার্কিনমুলুকের ২১টি প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।

মে মাসের গোড়ায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ছাঁটাই কাজের ৪২ শতাংশই মুছে গিয়েছে পাকাপাকিভাবে।

এপ্রিলের শেষে, আর মে’র গোড়ায় সেনসাস ব্যুরোর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৪৭ শতাংশই, অথবা তাঁর পরিবারের কেউ মার্চের ১৩ তারিখ থেকে কাজ হারিয়েছেন। ৩৯ শতাংশের আশঙ্কা, তাঁর অথবা পরিবারের কেউ একজন আগামী মাসের মধ্যে কাজ হারাবেন। ১১ শতাংশ জানিয়েছে তাঁরা সময়মতো ভাড়া দিতে পারেননি, অথবা কিস্তির অর্থ মেটাতে পারেননি। আগামী মাসে দেওয়ার ব্যাপারে সংশয়ে ২১ শতাংশ।

ব্রিটিশ গার্ডিয়ানের চোখে ব্যাঙ্কার জ্যাকব ওয়ালেনবার্গ হলেন সুইডেনের আর্থিক রাজ পরিবারের যুবরাজ। এহেন ওয়ালেনবার্গের সতর্কবার্তা: ‘পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নেই। তৈরি হবে সামাজিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিণতি হবে ভয়াবহ: নাটকীয় চেহারা নেবে বেকারত্ব। অনেকে মারা যাবেন, বাকিদের অবস্থা হবে শোচনীয়।’

সুইডিশ শিল্পপতি ওয়ালেনবার্গ, যাঁর পরিবারের শেয়ার রয়েছে এরিকসন থেকে এসইবি ব্যাঙ্কে, সেই তিনি শুনিয়েছেন, যদি সঙ্কট দীর্ঘদিন চলে, তবে বেকারত্ব ছুঁতে পারে ২০-৩০ শতাংশ, অর্থনীতির সঙ্কোচন ঘটতে পারে ২০-৩০ শতাংশ (করোনাভাইরাসের ‘ওষুধ’

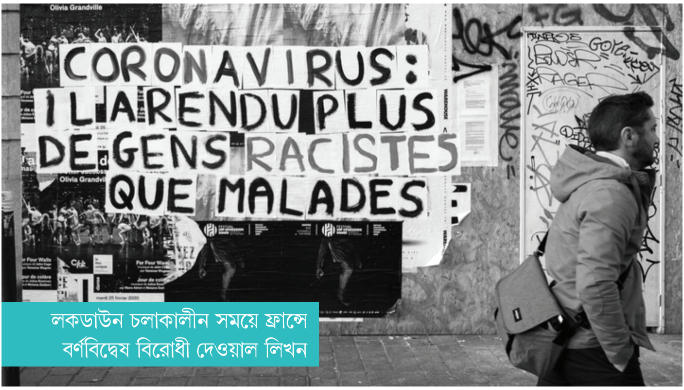

লকডাউন চলাকালীন সময়ে ফ্রান্সে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী দেওয়াল লিখন

উসকে দিতে পারে সামাজিক ভাঙনকে, ব্রিটিশ ফিনান্সিয়াল টাইমস)।

এই পরিস্থিতিতে দু'টিই পথ।

এক. 'নয়া উদারবাদী সরকার' ব্যবহার করতে পারে 'মহামারি পুঁজিবাদের' যুক্তিকে। আর একেই নয়া উদার অর্থনীতিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা 'ঢাল' হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। জনগণের সম্পদ বেসরকারি ক্ষেত্রের দিকে চালান আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আর এভাবেই তারা রক্ষা করতে পারে বিত্তবানদের স্বার্থ। এই পরিস্থিতি জ্বালানি জোগাতে পারে নব্য ফ্যাসিস্ত শক্তিকে। নয়া নাৎসিদের। 'একটি চরম সঙ্কটকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা দস্তুরমতো জানে ইউরোপের উগ্র দক্ষিণপন্থীরা'(পলিটিকো, ২৭ এপ্রিল ২০২০)।

দুই. তবে সঙ্কট এমন সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে, যাতে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের সুরক্ষার জন্য নীতি তৈরি হতে পারে। যা তৈরি করতে একটি ন্যূনতম মজুরি, সবার জন্য কাজ, সবার জন্য সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা– একটি টেঁকসই অর্থনীতি, যা সুরক্ষিত করতে পারে আমাদের বসুন্ধরাকে, আমাদেরকে।

আজ, এই মুহূর্তে ট্রাম্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা, প্রাক্তন গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি জনগণকে 'মার্কিন জীবনধারার' জন্য 'আত্মত্যাগ করতে' বলেছেন।

যে 'জীবনধারা' হাজারো মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে ধনকুবেরদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে সদা তৎপর। এই আকালেও যে জীবনধারায় এপ্রিলের এক সপ্তাহে মার্কিনমুলুকে বেকারভাতার জন্য যখন ৫২ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে, তখন অ্যামাজনের জেফ বেজোস, ফেসবুকের মার্ক জুকেরবার্গ, মাইক্রোসফটের বিল গেটসরা মুনাফা

করেন শয়ে শয়ে কোটি ডলার। যেমন বহু আগে বলে গিয়েছিলেন মার্কস: 'সামাজিক ব্যবস্থার একেবারে মূলেই রয়েছে একটা পচন, যা তার দুর্দশা লাঘব না করেই বাড়িয়ে চলে তার সম্পদ।'

যে জীবনধারায় যখন যুদ্ধবিমানের প্রাচুর্য্য থাকে, তখন জীবনদায়ী ভেন্টিলেটর থাকে সাকুল্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার, যেখানে অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য দরকার ১০ লক্ষের বেশি। যে জীবনধারায় দেশের অর্ধেক মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে একটি বেতন পাওয়া থেকে আরেক বেতনের অপেক্ষায়, ৪ কোটি মানুষ রয়েছেন দারিদ্রের মধ্যে, ৮ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের হয় কোনও বীমাই নেই, অথবা যে বীমাটুকু আছে তাতে সামান্য চিকিৎসা পর্যন্ত হয় না, এবং ৫ লক্ষ এমন মানুষ আছেন, যাঁদের নেই মাথা গোঁজার কোনও জায়গা।

যে জীবনধারায় নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু হয় পুলিশের নির্বিকার গুলিতে, বিপরীতে মিশিগানে বিক্ষোভরত সশস্ত্র নব্য-নাৎসিদের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সার্টিফিকেট দেন: ওরা সবাই 'ভালো মানুষ'!

লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণায় 'স্বস্তিকা' প্রতীক নিয়ে মিশিগানের আইনসভার সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় নব্য-নাৎসিরা। আর তা দেখে মিশিগানের ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্রেচেন হুইটনারকে ওইসব 'ভালো মানুষদের' সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বলেন ট্রাম্প। এক টুইটে ট্রাম্প বলেন, 'ওরা সবাই ভালো মানুষ। তবে ক্ষুব্ধ। ওরা নিরাপদে ওদের আগের জীবনে ফিরে যেতে চান। ওদের দিকে তাকান, ওদের কথা শুনুন, একটা বোঝাপড়ায় আসুন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির উপর গবেষণা করে থাকে সাউদার্ন পভার্টি ল সেন্টার। তাদের সমীক্ষা বলছে, ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫ শতাংশ। করোনা মোকাবিলায় ট্রাম্পের হাতিয়ার বর্ণবিদ্বেষ। গোড়া থেকে হালকা চালে দেখে এসে পরে বলতে শুরু করেন 'চীনা ভাইরাস'। বছরের শুরুতেও চীনের সরকারের প্রতি ট্রাম্পের বার্তা ছিল: দুরন্ত কাজ করছে চীন! ২৪ জানুয়ারি, এক টুইটে বলেন, 'করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কঠোর পরিশ্রম করছে চীন। তাদের কাজ ও স্বচ্ছতাকে খুবই প্রশংসা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' আসলে শুরুতে ট্রাম্প তেমন আমলই দেননি। করোনাভাইরাসের আক্রমণকে বরং ছোট করে দেখেছিলেন। গড়িমসি দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন এনিয়ে মার্কিন নাগরিকদের অযথা উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। ৫ ফেব্রুয়ারি,

টুইটে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৫ জন আক্রান্ত। প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন।' ক'দিন বাদেই ২২ ফেব্রুয়ারি টুইটে বলেন: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস একেবারেই নিয়ন্ত্রণে।' ক'দিন বাদে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে তুলনা করেন। এরপরেই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিজের অপদার্থতা ঢাকতে ফাটান বর্ণবাদী শব্দবোমা 'চীনা ভাইরাস'। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন বর্ণবিদ্বেষী-ভাইরাস। বিদেশসচিব মাইক পম্পিও বলেন, 'হুয়ান ভাইরাস'। হোয়াইট হাউসের একজন কর্তা বলেন 'কুঙ ফ্লু' (ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৭ মার্চ)।

যেমন বলেছেন ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা স্টিভ ব্যানন। 'আমি চাই ওরা প্রতিদিন জাতি-বর্ণ (বিদ্বেষ) নিয়ে কথা বলুক। যদি জাতি আর পরিচিতিসত্ত্বার দিকে ফোকাস করে এবং আমরা অর্থনৈতিক-জাতীয়তাবাদ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, তবে আমরা সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারব ডেমোক্র্যাটদের।' ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধের ব্যবহার রুখতে গিয়ে ট্রাম্পের রোষের মুখে মার্কিন বায়োমেডিক্যাল অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রধান, ভ্যাকসিন-বিশেষজ্ঞ রিক ব্রাইট। অপসারিত 'করোনা যোদ্ধা' ব্রাইট। ট্রাম্প একা নন। একইভাবে 'ট্রপিকের ট্রাম্প' ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি বোলসোনারোর রোষের শিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী লুইজ হেনরিক ম্যানডেট্টা। মানুষকে ঘরে থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার পরামর্শ দেওয়ার 'অপরাধে' অপসারিত ম্যানডেট্টা। ট্রাম্পের ঢঙেই বোলসোনারো করোনাভাইরাসকে বলেছিলেন 'লিটল ফ্লু', সাধারণ সর্দিকাশি।

'বিশ্ব যখন মৃত্যু থামানোর লড়াইয়ে, উগ্র দক্ষিণপন্থীরা তখন আনন্দে মেতেছে কোভিড-১৯ নিয়ে।' শিরোনাম আল জাজিরায়। একদিকে যখন করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখন 'কট্টর উগ্র দক্ষিণপন্থীদের অনেকেই মনে করেন, এই সঙ্কটকে স্বাগত জানানো উচিত।' আগ্রাসী নব্য-নাৎসি, যাঁরা চান সভ্যতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক, তাঁরা আশায় আছেন কোভিড-১৯ হতে চলেছে তাঁদের গোপন হাতিয়ার। যেমন বলেছেন আমেরিকান ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী, উগ্র দক্ষিণপন্থা বিষয়ের গবেষক সিন্থিয়া মিলার-ইদ্রিস, 'উগ্র দক্ষিণপন্থীদের ব্যবহারের জন্য এই পরিস্থিতি একেবারে উপযুক্ত।'

স্পেনের দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ভক্স পার্টি তাদের রাজনৈতিক
 সমাবেশে দাবি করেছে বিদেশী হামলাবাজদের (চীনা ভাইরাস)

বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের ‘অ্যান্টিবডি’। যেমন বলেছেন ভক্স নেতা জেভিয়ার ওর্তেগা স্মিথ, ‘আমার শরীরের স্প্যানিশ অ্যান্টিবডিই রুখে দেবে চীনা ভাইরাসকে।’

সুইডেনের নব্য-নাৎসি নর্ডিক রেজিসট্যান্স মুভমেন্টের (এনআরএম) নেতা সাইমন লিন্ডবার্গ তাঁদের ওয়েবসাইটে কোনও রাখঢাক না করেই বলেছেন তিনি এই মহামারিকে ‘স্বাগত’ জানাচ্ছেন, কারণ তাদের গোষ্ঠী যে পৃথিবীকে দেখতে চায়, তা তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে এই মহামারি। ‘এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের আনতে হবে একটি সত্যিকারের জাতীয় অভ্যুত্থান এবং জোরদার করতে হবে একটি বৈপ্লবিক (তাদের চোখে) রাজনৈতিক শক্তিকে।’

জার্মানিতে নব্য-নাৎসি গোষ্ঠী দ্য রাইট দাবি করেছে ইউরোপীয় নয় এমন নাগরিকদের জন্য সীমান্ত সিল করে দেওয়া উচিত। আরেকটি জার্মান নব্য-নাৎসি গোষ্ঠী দ্য নাউ ওয়ে এই ভাইরাসকে ‘বিভেদের কৌশল’ হিসেবে জার্মান নেতাদের ব্যবহার করা উচিত বলে সওয়াল করেছে, যাতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের ‘বন্যাকে’ প্রতিরোধ করা যায়।

ইউক্রেনের উগ্র দক্ষিণপন্থী অ্যাজোভ মুভমেন্ট দাবি করেছে কোভিড-১৯ ছড়ানোর জন্য ‘সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গরা দায়ী নয়’। ইতালিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীই এই ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী।

ইতালিতে উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তিও সালভিনি দাবি করেছেন, ‘আফ্রিকা থেকে অভিবাসীদের ঢুকতে দেওয়ার কারণেই (ইতালিতে) ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস, যেখানে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আগেই নিশ্চিত হয়েছিল।’ ২৪ ফেব্রুয়ারি, উগ্র দক্ষিণপন্থী লেগা পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা সালভিনি যখন এই অভিযোগ করছেন, তখন ইতালিতে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৯ জন, আর মারা গিয়েছেন ৬ জন, যেখানে গোটা আফ্রিকায় আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র ১ জন, মিশরে (ব্রিটিশ দ্য গার্ডিয়ান)। ‘করোনাভাইরাস নয়, ভাইরাস ছড়াতে সাহায্য করছে আসলে সরকার’, শিরোনাম ইতালির দক্ষিণপন্থী পত্রিকা লিবেরো’তে। প্রধানমন্ত্রী ‘কোন্তে, তাঁর বিজ্ঞানীরা এবং বর্ণবাদই (পূর্ব এশিয়ার মানুষদের লক্ষ্য করে) হলো আসল রোগ।’

ফ্রান্সে উগ্র দক্ষিণপন্থী নেত্রে মেরি লি পেন করোনা মহামারিকে ব্যবহার করে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের সীমান্ত বন্ধ করতে বলছেন।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে মুক্ত সীমান্ত চুক্তি 'শেনজেন' বাতিলের দাবি তুলেছেন। জার্মানি ও স্পেনের উগ্র দক্ষিণপন্থী দলগুলিও একই দাবিতে সোচ্চার।

কোভিড-১৯, গণতন্ত্রের জন্য অশনিসঙ্কেত। ভাইরাসকে নয়, হত্যা করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে।

যত দোষ কোভিডে। সামাজিক, অর্থনৈতিক – সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে কোভিডকে। আর এভাবেই দেশে-দেশে যাবতীয় দায় এড়ানোর ভাষ্য নির্মাণের চেষ্টা চলছে। পঞ্চাশটির বেশি দেশ জারি করেছে জরুরি অবস্থা।

হাঙ্গেরিতে, ৩০ মার্চ সংসদে পাস হয়েছে নতুন আইন। এই আইনে প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানকে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংসদকে এড়িয়ে ডিক্রি জারি করে তিনি যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারবেন ক্ষমতায়। আর তাঁর কোনও পদক্ষেপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না সংসদে। ইচ্ছা করলে দেশের প্রচলিত যে আইন রয়েছে, সেই আইনের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন। প্রয়োজন হলে স্থগিত রাখতে পারবেন দেশের সংবিধান।

হাঙ্গেরিতে ওরবান একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এভাবেই পৃথিবীর বেশকিছু দেশে শাসকরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করছেন। চলছে সংসদের ক্ষমতা কমানো, বিরোধী নেতাকর্মীদের ধরপাকড়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। করোনাভাইরাস তাঁদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। আজারবাইজান, রাশিয়া, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইজরায়েল কিংবা তুরস্ক হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি রডরিগো দুর্তাতে সংসদে আইন পাস করিয়ে নিজের হাতে প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই নিয়েছেন। অত্যন্ত

চলছে সংসদের ক্ষমতা কমানো, বিরোধী নেতাকর্মীদের ধরপাকড়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। করোনাভাইরাস তাঁদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে

কঠোরভাবে লাগু করছেন ‘সামাজিক দূরত্বের’ বিধি। প্রয়োজনে গুলি করারও নির্দেশ দিয়েছেন। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। থাইল্যান্ডেও প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন জরুরি ক্ষমতা। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে নতুন ডিক্রি জারি করেছেন। পোল্যান্ডে এমন আইন আনার চেষ্টা চলছে যাতে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মুখ খুলতে না পারেন।

‘করোনাভাইরাস মহামারি পরিণত হচ্ছে বিরাট এক মানবাধিকার সঙ্কটে।’ সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ব্যক্তির মানবাধিকার গুঁড়িয়ে দিতে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের গতি রোধ করার জন্য কোনও স্বৈরাচারী রাষ্ট্র যেন একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আপতকালীন ব্যবস্থা জারি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, তা এখন দ্রুততার সঙ্গে পরিণত হচ্ছে মানবাধিকার সঙ্কটে। বলেছেন গুতেরেস। রাষ্ট্রসঙ্ঘ দেখেছে, ভুয়ো খবরকে ভিত্তি করে সাংবাদিক, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অ্যাক্টিভিস্ট ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ‘ভুল তথ্য ও বিকৃত তথ্য ঠেকানোর নামে নেওয়া অতিরিক্ত পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি এর মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অথবা অনিচ্ছাকৃত সেনসরশিপও শুরু হয়ে যাচ্ছে।’

উগ্র দক্ষিণপন্থার আস্ফালনের বিপরীতেই রয়েছে বিকল্পের জন্য সংগ্রাম। ২০১৯ দেখেছে বছরভর বিশ্বায়িত প্রতিবাদ। দুনিয়াজুড়ে ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপে, লাতিন আমেরিকায় আসছে ‘সমাজতন্ত্রের’ কথা। সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে দু’বছর আগে ইকনমিস্টের মতো পত্রিকার পরামর্শ: মার্কসকে পড়ুন। ‘বিশ্বের শাসকরা: কার্ল মার্কস পড়ুন!’

অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে মার্কসের অমোঘ লাইন ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় বটে, তবে ‘প্রথমবার হয় ট্র্যাজেডি, দ্বিতীয়বার হয়ে পড়ে প্রহসন।’ সেই বক্তব্য ধরেই ইকনমিস্টের উপশিরোনাম, ‘দ্বিতীয়বার, প্রহসন।’ ক’বছর আগে মেরিয়ম ওয়েবস্টার অনলাইন অভিধানের সবচেয়ে সন্ধানী শব্দ ছিল ‘সমাজতন্ত্র’। ২০১৬, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় এই সহস্রাব্দের তরুণদের অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করেছে পুঁজিবাদকে। তিনভাগের একভাগ সমাজতন্ত্রের পক্ষে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে উপসম্পাদকীয়: ‘শুভ জন্মদিন কার্ল মার্কস। আপনি ছিলেন সঠিক।’

ব্রিটেনে জেরেমি করবিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ণি স্যান্ডার্স, কিংবা ফ্রান্সে জ্যাঁ-লুক মেলেশোঁর বক্তব্য থেকে লাতিন আমেরিকায় উঠে আসছে বিকল্পের কথা। সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শ্রমঘণ্টা, অবসরের বয়স কমানোসহ ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি। ব্রিটেনে রেল, ডাক, শক্তি সংস্থাগুলির জাতীয়করণের স্লোগান। ফ্রান্সে সমরাস্ত্র শিল্প এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জাতীয়করণের কথা। মার্কিনমুলুকে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার' দাবি।

২০১৯, দুনিয়াজুড়ে ছিল প্রতিবাদের ঢেউ। বিকল্পের সন্ধানে।

পাঁচ ডিসেম্বর। ধর্মঘটে স্তব্ধ ফ্রান্স। পাঁচদিনের মধ্যে আবার। অচল দেশ। কলম্বিয়ায় দু'সপ্তাহের মধ্যে তিন-তিনবার ধর্মঘট। ফ্রান্সে ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন অতিক্রম করেছে এক বছর। হাইতিতে ৫২৭ দিন ধরে চলছে প্রতিবাদ। আলজেরিয়ায় টানা ৪২-সপ্তাহ। দু'মাস চিলি রাস্তায়। একই চেহারা লেবানন, ইরাকে। প্রতিদিন বিক্ষোভ, অবরোধ। তালিকায় পরে যুক্ত হয়েছে বলিভিয়া, ইরান। বলিভিয়ায় অভ্যুত্থানের পরেই রাস্তায় নামেন শ্রমিকরা, আদি জনগোষ্ঠীর মানুষ।

বিক্ষোভের আগুনে তখন আদতেই পুড়ছে নয়া উদারবাদ। ইকুয়েদর থেকে চিলি, আর্জেন্টিনা থেকে কলম্বিয়া– সর্বত্র। অভিমুখ ফের বামপন্থায়। এবং লাতিন আমেরিকা শুধু লড়ছিলই না। ভাঙছিল নয়া উদারবাদী মডেলকে, তার মূল অক্ষ চিলি থেকে।

বিদ্রোহে, ব্যালটে অসন্তোষ। এবং শুধু লাতিন আমেরিকা নয়।

সান্তিয়াগো থেকে ওয়েস্ট পাপুয়া। বেইরুট থেকে বাগদাদ। কুইটো থেকে কায়রো। ডেট্রয়েট থেকে শিকাগো। প্যারিস থেকে পোর্ট অব প্রিন্স। আলজেরিয়া থেকে জর্ডন। সর্বত্র বিক্ষোভ। রাস্তায় জনরোষ।

এক বেপরোয়া প্রতিরোধ। জরুরি অবস্থা, কারফিউ। সেনা জওয়ানের বেয়নেট উড়িয়ে মুখোমুখি লড়াই। বিশ্ব পুঁজিবাদের মুখপত্র দ্য ইকনমিস্ট দেখেছিল 'রাস্তায় ক্রোধের বিস্ফোরণ'। ছয়ের দশকের পর 'বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার দ্বিতীয় স্রোত'। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের অসহায় আর্তনাদ: 'বিশ্বজোড়া প্রতিবাদের জবাব হলো মোকাবিলা করতে হবে নতুন অসাম্যকে।' এক 'নতুন প্রজন্মের অসাম্যের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাকে ঘিরে, প্রযুক্তির পরিধিতে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনে।'

'নানা ঘটনা মানুষকে টেনে আনছে রাস্তায়– ট্রেনের টিকিটের দাম, পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি থেকে ন্যায়বিচারের চাহিদা। আর এগুলিই হলো অসাম্যের নতুন মুখ।'

কোথাও মেট্রোর ভাড়াবৃদ্ধি দিয়ে শুরু। কোথাও আবার হোয়াটসঅ্যাপে কলের উপর কর বসানোর বিরুদ্ধে অসন্তোষের প্রথম প্রকাশ। ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ কোথাও ছিটকে বেরিয়ে এসেছে জ্বালানিতে ভরতুকির অবসানে। কোথাও স্বাধীনতার দাবিতে। কোথাও দীর্ঘদিনের মজুরি বাড়ানো নিয়ে সংঘাত। কোথাও দুর্নীতি আর দারিদ্রের বিরুদ্ধে জমাট রোষ। কোথাও নির্বাচনে জয়ের পরেও গণতন্ত্র, বিকল্প অর্থনীতিকে রক্ষার সংগ্রাম। কোথাও খাদ্যের জন্য হাহাকারে স্তব্ধ জনজীবন। ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে শেষে বিস্ফোরণ।

বিশ্বজোড়া এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেহারা ভিন্ন হলেও, ছিল একটি সাধারণ সুতোয় বাধা।

শ্রেণি সংঘাতের সরল পাটিগণিত: জনগণ বনাম নয়া উদারবাদ। কানাগলিতে নয়া উদারবাদ। দেখিয়ে চলেছে দক্ষিণপন্থার সীমাবদ্ধতা। সঙ্কট থেকে উদ্ধারে তাদের হাতে নেই কোনও বিকল্প। মানুষ তাই রাস্তায়, বিকল্পের সন্ধানে।

নয়া উদারবাদের প্রতিরোধে দুনিয়াজুড়ে এক নতুন প্রজন্মের উত্থান। চিলির যে তরুণী সাঁজোয়া গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন, তিনি আসলে আঘাত করেন নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে। যে কারণে চিলির তরুণ ঠাণ্ডা গলায় টেলিভিশনে বলেন, ‘আমাদের প্রতিবাদ গোটা ব্যবস্থার সমস্যার বিরুদ্ধে।’ তাঁর জীবনের উপলব্ধি, ‘সবার উপরে, নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।’

ধর্মঘটের ঢেউ মার্কিনমুলুকে। প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল মোটরসকে দেখে আর ঝুঁকি নেয়নি ফোর্ড মোটর। ধর্মঘট এড়াতে আগেভাগেই সম্ভাব্য চুক্তি করেছে ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্সের সঙ্গে। মার্কিনমুলুকে রীতিমতো ধর্মঘট আর প্রতিবাদ-আন্দোলনের ঝড়। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ১৩টি পৃথক ধর্মঘটে শামিল অন্তত ৮৫,০০০ শ্রমিক-কর্মচারী। শিরোনাম ইন দিস টাইমস পত্রিকায়। লেবার ব্যুরোর স্ট্যাটিসটিক্সের হিসেবে, ২০১৮-তে ধর্মঘটে শামিল শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪,৮৫,০০০। শেষ ৩২-বছরে সর্বাধিক। এবারে প্রবণতা যা, গত বছরকেও তা ছপিয়ে যাবে।

অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। আল আহরম পত্রিকায় শিরোনাম: প্রতিবাদের ‘দ্বিতীয় স্রোত’। মধ্যপ্রাচ্যে সর্বত্র বিক্ষোভ। প্রতিরোধ। নেতার বদল নয়, মানুষ চাইছিলেন ব্যবস্থার বদল। মানুষ চাইছিলেন কাজ।
 জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নাগরিক পরিষেবা। সেসময় তাহরির

ইনস্টিটিউটের গবেষক তিমোথি কালদাস ভাষ্যে, ‘এক জায়গায় প্রতিবাদ দেখে অন্যরা উৎসাহিত হচ্ছেন, রাস্তায় নামছেন। একে অপরের থেকে শিখছেন। এই বিক্ষোভ একজন প্রধানমন্ত্রী, কিংবা একজন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নয়, তাবৎ শাসকশ্রেণির অপসারণের দাবিতে এই গণঅভ্যুত্থান।’

করোনায় সেই অসন্তোষ মোটেই মিইয়ে যায়নি। বরং বলা ভালো, ‘মিউট’ রয়েছে। ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। স্বাভাবিক। কারণ বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধা আরও বেড়েছে।

অর্থনীতির ঝাঁপ বন্ধ করা নয়। ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদ মহামারি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। পুঁজিবাদ পারেনি জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সুরক্ষা দিতে। অথবা, আজ আমরা যেসব জরুরি সমস্যার মুখোমুখি, তার কোনও কিছু থেকেই রক্ষা করতে পারেনি পুঁজিবাদ। পারার কথাও নয়।

এখান থেকে ব্যবস্থার পরিবর্তনই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধনী বাদে প্রত্যেকের দাবি হোক পুঁজিবাদের অবসান। দাবি হোক প্রত্যেকের কাজের, অথবা রোজগারের অধিকার, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, উচ্ছেদরোধ– এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার।

Regd. No. RN/37318/81 MARXBADI PATH May 2020, Vol. 39, No. 3

Editor : SURYAKANTA MISHRA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Kolkata-700016

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে
দেবাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,
কলকাতা-১৬ (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন) থেকে প্রকাশিত।